# ছন্দ ও অলঙ্কার

UNDER THE MATCHING
GRANT SCHEME
of R R R L F
for the Year ..............

অতীন্দ্র মজুমদার

অধ্যাপক : মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় : অস্ট্রেলিয়া

ন য়া প্র কা শ। ক লি কা তা—ছ য়
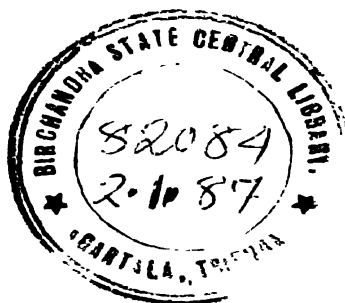
**Chhanda-o-Alankar**

Metrics & Rhetoric in Bengali

**Price Rupees Ten only**

Printed on concessional rate paper

**ছন্দ ও অলঙ্কার**

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশনে

বারীন্দ্র মিত্র

নয়া প্রকাশ

২০৬, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

সজ্জায়

পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রণে

দরবারী উদ্যোগ

গংগানগর

২৪ পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ

**দাম দশ টাকা**

সরকার প্রদত্ত সুলভ মূল্যের কাগজে মুদ্রিত

## ॥ ভূমিকা ॥

কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল-কলেজের গণ্ডীর বাইরে যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠক ছন্দবিজ্ঞান এবং অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁদের জন্য যতটা সহজ, সরলভাবে আমার দ্বারা সম্ভব—সেইভাবে জিনিষটি উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি। তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে মূল-ধারণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ॥

এই প্রচেষ্টা কিছুতেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে পারত না, যদি আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ রবীন্দ্র মজুমদার এবং বর্ধমান রাজ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক-বন্ধু শ্রীঅবন্তী সান্যাল আমাকে উৎসাহ না দিতেন এবং নয়া প্রকাশের তরুণ দুঃসাহসী প্রকাশক বন্ধু শ্রীবারীন্দ্র মিত্র একে প্রকাশ করার দায়িত্ব না নিতেন। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে এই তিনজনের কাছে আমি এই গ্রন্থরচনার জন্য প্রেরণা পেয়েছি। কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই ॥

অলঙ্কারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তীর মতামত এবং সংগৃহীত তথ্যকে আমি প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি, গ্রন্থ মধ্যেও যেখানে প্রয়োজন সেখানে তার স্বীকৃতি আছে। আচার্যপ্রতীম শ্রীযুক্ত কুলভূষণ চক্রবর্তী এম. এ. ( ইংরাজি ) এবং শ্রীযুক্ত দেবদেব ভট্টাচার্য এম. এ. ( ইংরাজি ও সংস্কৃত ), অষ্টতীর্থ, অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নানা মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে বাধিত ও অনুগৃহীত করেছেন। আজ যখন এই গ্রন্থ সমাপ্ত হল, তখন এই তিনজন শ্রদ্ধেয় আচার্যের উদ্দেশ্যে বিনীত নমস্কার নিবেদন করি ॥

অতীন্দ্র মজুমদার ॥

# ॥ সূচীপত্র ॥

।। স্বর্গত আচার্য
বিভূতিভূষণ ভট্টের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ।।

## প্রথম অধ্যায়

# অলঙ্কার

# ॥ কথারম্ভ ॥

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি মেয়েলী প্রবাদে বলে 'সাজালে গোছালে নারী আর লেপ্‌লে পুঁছলে বাড়ী।' পশ্চিম বাংলায় ঐ প্রবাদটিরই একটি রূপান্তর দেখতে পাচ্ছি—'নিকালে চুকালে মাটি, আর সাজালে গুছালে বিটি।' দুটি প্রবাদে ভাষার সামান্য পার্থক্য থাকলেও, মূল বক্তব্য বিচারে দুটি প্রবাদই যে একই বিষয় প্রকাশ করছে, তাতে সন্দেহ নাই। যত কুরূপা মেয়েই হোক না কেন, তাকে যদি উপযুক্ত ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া যায়,—হাতে, গলায়, নাকে, কানে সিঁথিতে দেখতে ভাল কিছু গয়না পরিয়ে দেওয়া হয়, চোখে কাজল আর পরনে যদি দেওয়া হয় সুন্দর একটি রঙীন শাড়ি, চলতে ফিরতে যদি তার পায়ে বেজে ওঠে মধুর মঞ্জীর—তবে তাকে দেখে চোখে চমক লাগে, তার স্বাভাবিক রূপ ছাড়িয়ে আরেকটি রূপ মনে দোলা দেয়। মনে হয়, রোজ যাকে দেখি সাধারণ, আটপৌরে, নিতান্ত সহজ, আজ তাকে নানা বর্ণের বেশে এবং নানা ছাঁদের অলঙ্কারে যেন অন্যরকম লাগছে, দেখতে সুন্দর লাগছে, ভাল লাগছে! তেমনি একটি বাড়ীকে যদি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে সাজিয়ে গুছিয়ে লেপে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয় তবে, সে বাড়ী হোক না কুঁড়েঘর, তবুও তাকে দেখতে ভাল লাগে। যে মেয়েটিকে শাড়ি গয়না পরানো হল, তার দেহের বা শাড়ি-গয়নাগুলির আধারের কোন পরিবর্তন হল না, লেপ্‌লে পুঁছলে বাড়ীটার গড়নেও কোন বদল হল না—বদল হল তার সৌন্দর্যের, তার আবেদনের॥

এই সাজসজ্জা গয়নাগাঁটি যা দিয়ে একজনের সাধারণ চেহারাকে অসাধারণ করা হল তাকে আমরা বলি অলঙ্কার। নারীদেহের অলঙ্কার তার হাতের সোনার কাঁকন, গলার মুক্তাহার, নাকের বেসর, কানের দুল, কপালের টিপ। আমাদের মুখের কথাকেও তেমনি আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে ব্যবহার করতে পারি, তাতে সাদামাঠা নিতান্ত আটপৌরে কথারও রূপ বদল হতে পারে। এই সাজসজ্জার নামই অলঙ্কার এবং সাহিত্যে এই অলঙ্কার ব্যবহারের যে নিয়ম তাকে আমরা বলি অলঙ্কারশাস্ত্র॥

কিন্তু একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করতে হবে। সেটা হচ্ছে এই, কেবল কুরূপা মেয়েরই কি অলঙ্কার প্রয়োজন। সুন্দরী নারী কি অলঙ্কার ব্যবহার করেন না? করেন, বরং বলা চলে বেশি করেই করেন। তেমনি সাহিত্যে নিতান্ত সাধারণ, নেহাৎই আটপৌরে কথারই যে সাজসজ্জার প্রয়োজন তা নয়, সুন্দর কথারও অলঙ্কার প্রয়োজন। সুন্দরী নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য যথেষ্ট থাকলেও তিনি নিজেকে আরো সুন্দরী দেখানোর জন্যেই গয়না প্রসাধন ব্যবহার করেন। তেমনি কবিরা শিল্পীরা সুন্দর কথাকে আরো সুন্দর করার জন্য তাকে অলঙ্কারের প্রসাধন দেন॥

কিন্তু তার জন্যে নিয়ম কেন? নিয়ম এইজন্যে যে সুন্দর অনিয়ম সইতে পারেনা। পায়ের মলকে মাথার টোপর হিসাবে ব্যবহার করলে মাথায় পায়ে ভেদ থাকে না সত্যি, কিন্তু ঐভাবে রাস্তায় জনসমাজে কেউ বেরোবেন কি! পুরুষের হাতঘড়ির ব্যাণ্ড সীসের তৈরী হলেও নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেউ তাকে পায়ের গোছায় স্থান দেবেন না—কারণ সেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম হল। তেমনি এলো-পাথাড়ি একগাদা গয়নাকে নিজের শরীরে স্থান দিতে কোন রমণীই রাজী হবেন না, তা সে গয়নাগুলি জড়োয়া মুক্তার তৈরী হলেও। তেমনি বাক্যে যথেচ্ছ অলঙ্কার বসিয়ে দিলেই হবেনা, দেখতে হবে তার প্রয়োগটা সিদ্ধ কিনা, নিয়মসঙ্গত কিনা, স্বাভাবিক কিনা। প্রয়োগের সিদ্ধ রীতি দেখিয়ে দেওয়াই হচ্ছে অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ভাষার যেমন ব্যাকরণ একটি নিয়ম অলঙ্কারও তেমনি একটি নিয়ম॥

কিন্তু নিয়ম হোক, যা-ই হোক, একথা সত্যি বাক্যে অলঙ্কার আরোপ, দেহে অলঙ্কার আরোপের মতই সম্পূর্ণ বাইরের ব্যাপার। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার শাড়ি নিয়ে স্বয়ং দেবী দুর্গাও জন্মাননি। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তবে তা তাঁর অঙ্গকে শোভা দিয়েছিল। ‘স্যাঁকরা ডেকে মোহর কেটে’ গয়না গড়িয়ে তবে সুন্দরী রমণীর অঙ্গাভরণে ব্যবহার করা হয়। তেমনি বাক্যে ব্যবহৃত অলঙ্কারও বাইরের জিনিষ, কবি শিল্পী সাহিত্যিকরা সেই অলঙ্কার উদ্ভাবন করেন, বাক্যের অঙ্গে রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ করেন॥

# ।। অলঙ্কারের ইতিহাস ।।

বাইবেলে গল্প আছে, স্বর্গোদ্যানে আদম এবং ইভ প্রকৃতির কোলে নিরাবরণ দেহে বিচরণ করতেন, পোষাকের ব্যবহার অলঙ্কারের ব্যবহারের কথা তাঁরা জানতেনই না। কুক্ষণে শয়তানের প্ররোচনায় ইভ খেলেন জ্ঞানবৃক্ষের ফল, আদমকেও খাওয়ালেন—তখন থেকেই নিরাবরণা ইভের অঙ্গে উঠল ঘাসের ঘাগড়া, বাইবেলের মতে নারীদেহের আদিমতম অলঙ্কার! গল্প কথা বাদ দিলেও, মানব-সভ্যতার ইতিহাসেও দেখি, আদিম মানবীই কোন এক সময় যৌবনমদে মত্তা অবস্থায় নিজের অঙ্গে নিহত পশুর চামড়া, দাঁত, হাড়ের টুকরো দিয়ে বানিয়ে নিয়েছিল তার সেই সময়ের বুদ্ধি অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর সব গয়না। অলঙ্কারের সেই হচ্ছে প্রাচীনতম নিদর্শন—নানা গিরিগুহায়, পাহাড়ে-পর্বতে, মাটির তলে প্রাপ্ত জীবাশ্মে সেই গয়নার রূপ আমরা দেখেছি॥

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে এই যে কোন একটা জিনিষ নিয়ে সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্থলে যেই তার দ্রুতগমনের সুব্যবস্থা হল, অমনি সে হাত বাড়ালো জলের জগতের দিকে, শেষে মাথার উপরের আকাশে—এখন মহাশূন্যে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চংক্রমনের উদগ্র বাসনা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। ঠিক এই বাসনার তাগিদই তাকে নিজের দেহ সাজিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দিল না, সে সাজাতে সুরু করল তার বাসস্থান, পাথরের টুকরো দিয়ে গুহার গায়ে আঁকতে থাকল ছবি, শেষে তার মুখের ভাষার উপরও নজর পড়ল, তাকেও সে করল সুন্দর, অলঙ্কৃত॥

মুখের কথাকে সুন্দর করে আজ যে ভাবে আমরা বলি, বা অন্যে বললে প্রীত হই, তা একদিনে হয়নি। এরও একটা পূর্ব-ইতিহাস আছে যেমন আছে, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলার সলিতাপাকানো। ভাষায় অলঙ্কার ব্যবহারেরও তেমনি একটা ইতিহাস আছে, তবে সে ইতিহাসের আরম্ভের পাতাগুলি ছেঁড়া। অলঙ্কারের প্রথম অবস্থা কি ছিল, আজ তা জানতে পারা অসম্ভব। তবে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যগুলি খুঁজলে সেখানে অলঙ্কারের সন্ধান কিছু কিছু আমরা পাই, সেইগুলি এখন একটু আলোচনা করে দেখা যাক॥

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ চতুষ্টয়। পরবর্তী রচনা উপনিষদগুলি। ঋগ্‌বেদে আমরা পাচ্ছি অলঙ্কার শব্দটি এই বাক্যে 'বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরংকৃতা' (১।১।৩)। যাস্কমুনি বলেছেন অরংকৃত এবং অলংকৃত একই মানে। 'র' স্থানে 'ল' ব্যবহার মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈদিক অরংকৃত পরে সংস্কৃতে অলঙ্কৃত হয়েছে। কৌষীতকি উপনিষদের মধ্যেও দেখছি 'ব্রহ্মালঙ্কারেন অলঙ্কৃতৌ' (১।৩।৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাচ্ছি উপমা—গাছের সঙ্গে মানুষের উপমা দিয়ে বলা হয়েছে গাছের পাতা, বল্কল, রস, কাঠের মত মানুষের লোম, চামড়া, রক্ত এবং হাড়। এবং পুরুষের মজ্জা বৃক্ষের 'মজ্জোপমা' (৩।৯।২৮)। বাল্মীকির রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখছি 'অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা।' অরণ্যকাণ্ডের বহু জায়গায় কবিগুরু অলঙ্কার এবং উপমা শব্দটি ব্যবহার করেছেন—সীতার মুখ শুভ্র দন্তের দ্বারা অলঙ্কৃত, সূর্য আকাশকে অলঙ্কৃত করছেন, মতঙ্গ বনের উপমা দেওয়া হয়েছে দেবারণ্যের সঙ্গে, পম্পার জলকে উপমা দেওয়া হয়েছে স্ফটিকের সঙ্গে। মহাভারতেও এরকম উপমার অভাব নাই। মহাভারতের পাণ্ডব বীরদের চরিত্রগুলির নামকরণেও উপমা পাই, যেমন বৃকের মত উদর, বৃকোদর ( ভীম )। দ্রৌপদীর রূপবর্ণনায়, অর্জুনের শক্তি বর্ণনায়, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গুণ বর্ণনায় অনেক উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। বৈদিক ভাষায় একটি ধাতুও পাচ্ছি—রঞ্জ্‌ ধাতু, যার অর্থ অলঙ্কৃত করা। তবে বৈদিক সাহিত্যে, অলঙ্কার-শাস্ত্র বলে কিছুর উল্লেখ নাই, কারণ, এই শাস্ত্রসম্পর্কিত ধারণা তখন গড়ে ওঠেনি। 'উপমা' এই শব্দের সাহায্যেই তখন অলঙ্কারের ভাবটি বোঝানো হত। বেদের পরবর্তী সময়েও ভারতীয় সাহিত্যে উপমার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল ॥

উপমার কাজও ভাষাকে অলঙ্কৃত করা। যাস্কমুনির নিরুক্তে উপমাকে নিপাত হিসাবে নিয়ে উপমার অর্থ করা হয়েছে—অথ নিপাতাঃ। উচ্চাবচেষু অর্থেষু নিপতন্তি। উপমার্থে অপি। মহামুনি গার্গ্য উপমার সংজ্ঞা দিয়েছেন এই বলে—যদতত্তৎসদৃশম্‌ ইতি। এর মানে হচ্ছে উপমা এমন একটা জিনিষ যার দ্বারা যে বস্তু আসল বস্তু নয়, অথচ সেই বস্তুর মত, এমন বোঝানো হয়। যদি বলি মেঘের মত চুল, তবে জিনিষটা এই দাঁড়ায়—চুল মেঘ নয়, কিন্তু তবুও মেঘের মতন দেখতে। চুলের কৃষ্ণত্ব এবং মেঘের কৃষ্ণত্ব এই সাধারণ মিল চুলের এবং মেঘের মধ্যে আছে

বলেই চুলকে মেঘের সঙ্গে তুলনা বা উপমা দেওয়া হয়েছে। যাস্কমুনি নানা উপমার যেমন, কর্মোপমা, সিদ্ধোপমা, রূপোপমা, লুপ্তোপমা ইত্যাদির বহু উদাহরণ বৈদিক সাহিত্য থেকে দিয়েছেন। যথাস্থানে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে॥

যাস্কমুনির প্রায় পাঁচশ বছর পরে ভারতের আদি এবং শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনি তাঁর ব্যাকরণে উপমার আরো বিশদ আলোচনা করে উপমার কতকগুলি সূত্রও ঠিক করে দিয়ে গিয়েছেন। পাণিনিকৃত সূত্রের পরিপূরক হিসাবে বার্তিক সূত্র রচনা করেন পণ্ডিত কাত্যায়ন আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। তারও দুইশত বছর পরে পতঞ্জলি রচনা করেন পাণিনি সূত্রের 'মহাভাষ্য'॥

কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক নন। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা 'অলঙ্কার' শব্দটি, 'উপমা' শব্দটি এবং উপমার নানা অঙ্গ সম্বন্ধে খবর পেলেও সবচেয়ে বড় জিনিষ, কাব্যতত্ত্বের মধ্যে ব্যবহৃত অলঙ্কার এবং কাব্যালঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত উপমার কোন খোঁজ পাচ্ছি না। 'রূপক' শব্দটি পাচ্ছি ব্যাকরণের বাইরে। ব্রহ্মসূত্রে, কঠোপনিষদে, ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে রূপক শব্দটি পাচ্ছি। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের ১৬ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে পাচ্ছি—

উপমা দীপকং চৈব রূপকং যমকং তথা।
কাব্যস্যৈতে হ্যলঙ্কারাশ্চত্বরঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভরতমুনির আগেই উপমা রূপক দীপক ইত্যাদি অর্থালঙ্কার এবং যমক শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ ছিল॥

এরপরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দণ্ডীর কাব্যাদর্শে অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যের গুণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—অলঙ্কারই কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে। বিচিত্ররূপা বাণীর বন্ধনকৌশল কি হবে তাও তাঁর আগের পণ্ডিতরা বলে গেছেন—বলে গেছেন, অলঙ্কারই কাব্য-শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তিনি তাঁর সঙ্গে যোগ করেছেন—অভীষ্ঠ অর্থসংবলিত পদাবলীই কাব্য॥

দণ্ডীর পরে অলঙ্কারশাস্ত্র আলোচনা করেছেন আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে ভামহ। ভামহের একশত বছর পরে কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী বামন এবং রাজসভার সভাপতি উদ্ভট অলঙ্কারশাস্ত্রে আরও বহু নূতন তথ্য

সংযোজন করেন। আচার্য বামনই প্রথম সূত্রাকারে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন এবং নিজেই সেগুলির ব্যাখ্যা বা বৃত্তি সৃষ্টি করেন। আর উদ্ভট করেন ভামহের 'কাব্যালঙ্কারে'র ব্যাখ্যা—নাম 'ভামহ-বিবরণ'। এর পরে পাচ্ছি ধ্বন্যালোক বা ছন্দে রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র। রচয়িতা অজ্ঞাত, তবে দশম শতাব্দীতে ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যার বৃত্তি করেছেন আনন্দবর্ধন এবং সেই ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা করেছেন অভিনব গুপ্ত। তাঁর গ্রন্থের নাম 'লোচন'। সমকালীন কবি 'কুট্টনীমতম্' কাব্যের রচয়িতা দামোদরগুপ্তও তাঁর 'কুট্টনীমতম্' কাব্যে 'ছন্দতত্ত্ব অলঙ্কারতত্ত্ব বিশেষতঃ শৃঙ্গার রসতত্ত্ব' ইত্যাদি আলোচনা করেছেন ॥

এরপরে নবম শতাব্দীতে বিশেষ বিখ্যাত অলঙ্কারশাস্ত্রকার আচার্য রুদ্রট। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালঙ্কার'। রুদ্রটের স্বকীয়তা দেখা যায় নিজের সৃষ্টির একটি নূতন রীতি—'লাটিয়া'রীতির—প্রবর্তনে। দণ্ডীর কাব্যবিচার বৈদর্ভী আর গৌড়ী রীতিতে, বামনের রীতি পাঞ্চালী—এই তিনটির সঙ্গে তিনি যোগ করলেন তাঁর নিজের রীতি 'লাটিয়া'। রুদ্রটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কাকুবক্রোক্তি শব্দালঙ্কার। তিনি নবরসের সঙ্গে দশম রস যোগ করলেন 'প্রেয়ান্'। এটি বৈষ্ণব 'সখ্য' রসেরই সমজাতীয়। রুদ্রট দশটি রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসকেই তাঁর কাব্যালোচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন ॥

নবম শতাব্দীর শেষ থেকে ( ৮৮০ খৃঃ ) দশম শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত ( ৯২০ খৃঃ ) সময়ের বিখ্যাত আলঙ্কারিক রাজশেখর। তাঁর প্রাকৃত নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী' বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ এবং তার ভূমিকা 'কবিরহস্য'ও বিশেষ মূল্যবান রচনা। তিনি রুদ্রট এবং রুদ্রটের গুরু মহামুনি ভরতের মতামতেরই সমর্থক। তিনি কাব্যবিচারে রুদ্রটের লাটিয়রীতি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন কাব্যের শরীর শব্দার্থ ; সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য, ঔদার্য ইত্যাদি তার গুণ ; রস তার আত্মা এবং অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি তার অলঙ্কার। সাহিত্যে চুরিবিদ্যারও বিশদ আলোচনা করেছেন রাজশেখর ॥

দশম শতাব্দীর অন্যান্য কাব্যশাস্ত্র আলোচক হলেন ভট্টনায়ক, মুকুল, ধনঞ্জয়, ধনিক, ভট্টতৌত ইত্যাদি। মুকুলের গ্রন্থের নাম 'অভিধামাতৃকা'। মুকুলের শিষ্য ইন্দুরাজের উল্লেখযোগ্য রচনা উদ্ভটের 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে'র ব্যাখ্যা।

ভট্টনায়কের গ্রন্থ 'হৃদয়দর্পণ', কাব্যে রসাত্মবাদের সমর্থক। ধনঞ্জয়ের গ্রন্থ 'দশরূপক', আর তার ব্যাখ্যাকার ধনিক, বৃত্তির নাম 'অবলোক'। কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলা হয়েছে ॥

দশম শতকের শেষের এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিককার প্রখ্যাত অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদ্ অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাকর্তা সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর বিখ্যাত রচনা 'অভিনবভারতী' ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। অভিনবগুপ্তের প্রথম রচনা 'ধ্বন্যালোকে'র ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা—'লোচন'। অভিনবভারতী পরের রচনা। কাব্যে রসধ্বনিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা অভিনবগুপ্ত, ধ্বনিবাদের সর্বাঙ্গীণ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি ॥

কিন্তু এর বিরোধী প্রতিভাও জন্ম নিল অভিনবগুপ্তেরই স্বদেশে, কাশ্মীরে। নাম আচার্য মহিমভট্ট। মহিমভট্টের রচনার নাম 'ব্যক্তিবিবেক'। তিনি কাব্যের আত্মা বলেছেন 'রস'। কুন্তকের 'বক্রোক্তি'ও তিনি স্বীকার করেন না ॥

একাদশ শতকের প্রথম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশের মধ্যে যে-সব আলঙ্কারিক বিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে আছেন ক্ষেমেন্দ্র, ভোজরাজ, মম্মটভট্ট, রুদ্রভট্ট ইত্যাদি ॥

ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ দুখানি—'ঔচিত্যবিচারচর্চা' এবং 'কবিকণ্ঠাভরণ'। ক্ষেমেন্দ্রর মতে কাব্যে আসল জিনিষ হচ্ছে ঔচিত্য। পদ-বাক্য-গুণ-অলঙ্কার সবকেই বিচার করতে হবে ঔচিত্যের কষ্টিপাথরে। সে পরীক্ষায় টিকলে তবেই কবির রচনাকে আমরা কাব্য বলব, নতুবা নয় ॥

ভোজরাজের ( ভোজদেব ) বিখ্যাত বই 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণের' মাধ্যমে শাস্ত্রকার বলতে চেয়েছেন গ্রাম্যতা ইত্যাদি দোষহীন, প্রসাদ-মাধুর্য-ঔদার্য ইত্যাদি গুণযুক্ত, অনুপ্রাস উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারসম্বলিত এবং শৃঙ্গার করুণ ইত্যাদি 'রসে' রসান্বিত বাক্যই কাব্য। ভোজরাজ দণ্ডী বামন ইত্যাদির অলঙ্কার এবং রস গুণ সংক্রান্ত মত নিজের মতে সংশোধন করে নিয়েছেন। তিনি ধ্বনিবাদের বিরোধী ॥

মম্মটভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ' দুরূহ বই। তিনি কাব্যের তিনটি ভাগ করেছেন—ধ্বনিকাব্য, গুণীভূত ব্যঙ্গ্যকাব্য এবং চিত্রকাব্য। মম্মটভট্ট বলেছেন 'দোষহীন, গুণযুক্ত এবং অলঙ্কারযুক্ত বাক্যই কাব্য'। রুদ্রভট্টের বিখ্যাত বই 'শৃঙ্গারতিলকে'র

নানা শ্লোকের উদ্ধার দেখতে পাই শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে ॥

দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যান্য অলঙ্কারশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রুয্যক, প্রথম বাগ্‌ভট ও হেমচন্দ্র। রুয্যক ধ্বনিবাদী এবং কাশ্মীরের লোক। তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত' বা কাব্যপ্রকাশের টীকা, নিজস্ব মৌলিক চিন্তা বিধৃত আছে তাঁর 'অলঙ্কারসর্বস্ব'তে। 'অলঙ্কারসর্বস্ব'তে তিনি প্রধানতঃ শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাগ্‌ভট্ট নামে দুজন অলঙ্কারশাস্ত্রী ছিলেন, দুজনের জন্মের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের তফাৎ। প্রথম বাগ্‌ভটের 'কাব্যানুশাসন' সাধারণ বই। হেমচন্দ্রের অলঙ্কারশাস্ত্র সংক্রান্ত বইটির নামও 'কাব্যানুশাসন'। এতে হেমচন্দ্রের পূর্ববর্তী আচার্যদের অভিমত সঙ্কলিত হয়েছে। সেইজন্য একে সংকলন ও অভিধান দুই-ই বলা যেতে পারে ॥

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা মোটামুটি চারজন কাব্যশাস্ত্র-রচয়িতার সন্ধান পাচ্ছি। দ্বিতীয় বাগ্‌ভট্টের গ্রন্থখানির নামও 'কাব্যানুশাসন'। জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন অপ্পয়দীক্ষিত। সেই ব্যাখ্যার নাম 'কুবলয়ানন্দকারিকা'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই আলঙ্কারিক জয়দেব কিন্তু গীত-গোবিন্দ-রচয়িতা পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী কবি জয়দেব নন। সমকালীন অন্যান্য অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্ বিদ্যাধর এবং বিদ্যানাথ; এঁদের রচিত গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'একাবলী' এবং 'প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ'। এঁরা দুজনেই ধ্বনিবাদের সমর্থক ॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে যে তিনজন বিখ্যাত কাব্যশাস্ত্রকারের সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি তাঁদের মধ্যে বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং তাঁর গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণ', নানা সূত্রে সাহিত্য-রসিকদের পরিচিত। 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'—এই মতের সমর্থক বিশ্বনাথ কবিরাজ নাট্যতত্ত্বেরও বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর সাহিত্যদর্পণে। এই সময়ের অন্যান্য গ্রন্থকার ও তাঁদের গ্রন্থের নাম—ভানুদত্তের 'রসতরঙ্গিণী' এবং 'রসমঞ্জরী' এবং সিংহভূপালের 'রসার্ণবসুধাকর' ॥

দুশ' বছর পরে আরো দুজন কাব্যশাস্ত্রকারের নাম পাচ্ছি। তাঁদের একজন চৈতন্যদেবের ভক্ত অনুচর শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর। তিনি কবি নাট্যকার এবং আলঙ্কারিক। তাঁর 'অলঙ্কারকৌস্তুভ' গ্রন্থে কাব্যশাস্ত্র বিষয়ে

আলোচনা করা হলেও মূলতঃ সেখানি ভক্তিশাস্ত্র। শ্রীজীব গোস্বামীর 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' ব্যাকরণের ছলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের আলোচনা। 'অলঙ্কারকৌস্তভ'ও তাই। অপ্পয়দীক্ষিতের নাম আমরা আগে একবার পেয়েছি জয়দেবের প্রসঙ্গে। তাঁর অন্য গ্রন্থের নাম 'চিত্রমীমাংসা'। কবিকর্ণপুর এবং অপ্পয়দীক্ষিত—দুজনেই ধ্বনিবাদী। অপ্পয়দীক্ষিত বেদান্তবাদী এবং দার্শনিক ; এবং এই দুই বিষয়েই তাঁর গ্রন্থ আছে ॥

মাদ্রাজের পণ্ডিত জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীর আলঙ্কারিকদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি সম্ভবতঃ শাহজাহানের ছেলে দারাসেকোর সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যশাস্ত্রের নাম 'রসগঙ্গাধর'। আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তী রসগঙ্গাধরকে বলেছেন অনুপম কাব্যশাস্ত্র। তিনি জগন্নাথ পণ্ডিত সম্বন্ধে আরো বলেছেন—"জগন্নাথের কাব্যসংজ্ঞা—রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।···সেই অর্থই রমণীয়, যা লোকোত্তর অর্থাৎ মাত্র সহৃদয় কবির এবং পাঠকের সানুভাবসিদ্ধ আনন্দের জনকস্বরূপ (চমৎকৃতিময়) জ্ঞানের বিষয়ীভূত। 'লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা'-রূপ রমণীয়তাময় অর্থের ( বিষয়ের ) প্রতিপাদনসকল সুকুমার কলারই লক্ষ্য।··· মনে হয় পণ্ডিতরাজকৃত ( অর্থাৎ জগন্নাথ পণ্ডিতের ) এই সংজ্ঞাই কাব্যের চরমসংজ্ঞা এবং এর আলোকে আধুনিক কাব্যেরও বিচার চলতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে জগন্নাথ ধ্বনিবাদী ; কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রসবাদ, ধ্বনিবাদ, বক্রোক্তিবাদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে আত্মসাৎ করে সর্বাতিক্রান্ত-রূপে ভাস্বর হয়ে আছে তাঁর এই কাব্যসংজ্ঞাটি।" জগন্নাথ পণ্ডিতের মনীষা এবং পাণ্ডিত্যের এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর হতে পারেনা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রাচীন রীতিসম্মত আলোচনা কমে এসেছে। প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্যদেশের অলঙ্কারশাস্ত্র রচয়িতাদের মতবাদের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফলে অলঙ্কারশাস্ত্র আলোচনায় আমরা নতুন ধারা দেখতে পাচ্ছি। আধুনিক কালের এই সমস্ত অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যশাস্ত্র আলোচনায় আমরা তুলনামূলক আলোচনাই বেশি দেখছি, আধুনিক কাব্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও রসবস্তুর আলোচনায় পুরাতনরীতি কতদূর গ্রাহ্য ও প্রযোজ্য সে বিষয়েও চিত্তাকর্ষক আলোচনা

আধুনিককালের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত করেছেন এবং এখনও করছেন। কাব্যের রূপ, গুণ, তার চরিত্র এবং আদর্শ নিয়ে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও একেবারে আধুনিককালের বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্যজিজ্ঞাসা' ; ডক্টর সুশীল কুমার দে'র Studies in the History of Sanskrit Poetics ; ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'কাব্যালোক' ; আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' ; ডক্টর সুবোধকুমার সেনগুপ্তের ধ্বন্যালোক ও লোচনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, মোহিতলাল মজুমদারের 'কাব্য বিচার' ও নানা পত্রপত্রিকায় ছড়ানো বহু মূল্যবান প্রবন্ধ। এই শ্রদ্ধাস্পদ আলোচকরা সুগভীর পাণ্ডিত্য ও উজ্জ্বল মনীষার সমন্বয়ে বাংলা ভাষায় এই বিষয়ের গবেষণায় নূতন আলোকপাত করেছেন, নানা পুরাতন মতকে খণ্ডন করে নূতনভাবে সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করেছেন। আগামী বহু বৎসর পর্যন্ত এঁদের আলোচনা এই বিষয়ের গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে থাকবে।।*

* অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসের আরো বিস্তৃত অধ্যয়ন যারা পছন্দ করেন, তাঁদের পক্ষে একটি মূল্যবান বই P. V. Kane রচিত 'History of Alamkar Literature'.

# ধ্বনি, রীতি, রস

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ধ্বনি, রীতি, রস ইত্যাদি নানা শব্দ বিভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রবিদদের পরিচয় দেবার সময় প্রায়ই ঘুরে ফিরে এসেছে। অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ে সদ্য উৎসাহী নতুন পাঠক নিশ্চয়ই এই শব্দগুলি শুনে অস্বস্তিবোধ করেছেন ; হয়ত প্রচলিত অর্থে এই শব্দগুলিকে ধরে নিয়ে বাক্যের বা বক্তব্যের পটভূমিকায় তাদের স্থাপন করে কোন তাৎপর্য খুঁজে পাননি। এটাই স্বাভাবিক। কারণ আগে যে ধ্বনি, রস, রীতি ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তা কোনটিই প্রচলিত অর্থে নয়, ব্যবহৃত হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন term হিসাবে। সুতরাং অসুবিধা ত হবেই। সেই অসুবিধা দূর করবার জন্য এবার এই শব্দগুলির দ্বারা অলঙ্কারশাস্ত্রকারররা কি বলতে চেয়েছেন সেটাই অল্পকথায় বোঝাবার চেষ্টা করব ॥

**॥ ধ্বনি ॥**

রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে—

দ্বারে এসে গেলে ভুলে
পরশনে দ্বার যেত খুলে
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি।

দীর্ঘ বিরহে বিষণ্ণ প্রেমিকা নিজের ঘরে নির্জন অন্ধকারে প্রিয়তমের দর্শন আশায় নীরবে বসে আছে। গৃহকোণ দীপহীন, মনও উচাটন, কিন্তু হায়! প্রিয়তম তাকে দেখতে পেলনা। দরজার কাছে সে এসেছিল, বন্ধ দুয়ার হয়ত সামান্য করাঘাতে খুলেও যেত, কিন্তু প্রিয়তম তাকে চিনতে পারল না বোধহয়—তাই বন্ধ দুয়ারের সামনে তার উদ্বেগ স্তিমিত হয়ে গেল, ফিরে গেল কাউকেও না দেখে। প্রেমিকার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার উৎসুক ভবিতব্যের ওপর নেমে এল দুর্ভাগ্যের সুগভীর অন্ধকার, ভাগ্যতরী তীরের কাছাকাছি এসেও চিনতে-না-পারার নির্মম বালুচরে গতিহীনতার অভিশাপে স্থির স্থানু হয়ে গেল ॥

কবি এই ভাবটি তিন চারটি ছত্রে প্রকাশ করেছেন—মাত্র চৌদ্দটি শব্দের বাহনে। তাদের আক্ষরিক অর্থ অতি সরল এবং স্পষ্ট। কিন্তু পাঠক যখন এই তিনটি পঙক্তি পড়েন, তখন এই তিনটি পঙক্তিতে যা বলা হচ্ছে সেটাকেই আসল মনে করেন না। সেই তিনটি বাক্যকে অবলম্বন করে বহু বাক্যে প্রকাশ-যোগ্য—কিংবা হয়ত সবটা বাক্যে প্রকাশযোগ্যং নয়—একটি আশ্চর্য ভাব, একটি বিরহ বিধুর হৃদয়ের নিবিড় বেদনা, আসন্ন মিলনমুহূর্তে সুতীব্র হতাশার যন্ত্রণাকে এই চৌদ্দটি শব্দের মধ্যে দিয়ে আস্বাদ করতে পারেন। 'মা' এই কথাটি ছোট, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই সরস মাতৃত্বের সমস্ত স্বাদ আমরা পাই। শ্রেষ্ঠ কাব্যেও তাই। যা মাত্র শব্দের সাহায্যে বলা হচ্ছে সেটুকুই সব না, তাকে ছাপিয়ে আরো বহু বৃহৎ বিষয়ের ব্যঞ্জনা আমাদের মনকে আন্দোলিত করে তোলে। আলঙ্কারিকরা কবিতার এই যে শব্দার্থের বা বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, তারই নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি' ॥

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্গ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সুরিভিঃ কথিত ॥
[ ধ্বন্যালোক। ১।১৩ বৃত্তি ]

যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের সমস্ত প্রাধান্য ত্যাগ করে ব্যঞ্জনাময় অর্থ বা ব্যঙ্গ্য অর্থকেই প্রকাশ করে, সুরিভিঃ বা পণ্ডিতেরা তাকেই বলেছেন ধ্বনি। শব্দের অর্থের অতীত যে ব্যঞ্জনা তার আলঙ্কারিক পরিভাষার নাম ব্যঙ্গ্য বা ব্যঙ্গ্যার্থ। সুতরাং ধ্বনিবাদীরা কাব্যে একেই প্রধান স্থান দেবেন ॥

এখন প্রশ্ন হতে পারে কাব্যে এই ধ্বনিসৃষ্টিই কি আসল উদ্দেশ্য—এক কথায় ধ্বনিই কি কাব্যের আত্মা? এর উত্তর ধ্বনিবাদীরা দিয়েছেন এই ভাবে:— ধ্বনিবাদীরা বলেছেন অর্থযুক্ত কতকগুলি শব্দ নিয়ে বাক্য এবং বাক্য নিয়েই কাব্য—অর্থাৎ কাব্যের দেহ বা শরীর হচ্ছে বাক্য। এই বাক্যকে যদি সাজিয়ে গুছিয়ে দিই অর্থাৎ অলঙ্কৃত করি তবে তা নিশ্চয় সুন্দর শোনাবে, কিন্তু তা কাব্য হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। কারণ, অলঙ্কার বাইরের জিনিষ, আরোপিত বস্তু—তার কি এত শক্তি আছে, যে কেবলমাত্র তার দ্বারাই বক্তব্যের অতিরিক্ত প্রকাশ করা যাবে। রমণীর লাবণ্য দেহকে অবলম্বন করে থাকে, কিন্তু তা দেহাতীত, রমণীর

দেহে অলঙ্কার দিলেও সেই লাবণ্য থাকবে, না দিলেও থাকবে। আবার যে রমণীর হাত পা মাথা নাক বুক কান আছে কিন্তু লাবণ্য নাই, তাকে হাজার গয়না পরালেও লাবণ্য সৃষ্টি হবেনা। দেহটা যদি হয় objective, তবে দেহের লাবণ্য Subjective। দীপশিখার অগ্নি এবং উত্তাপ বাস্তব, কিন্তু তাকে অবলম্বন করে, যে আলোক, সেটা বাস্তবাতীত—তা না অগ্নি, না উত্তাপ। কাব্যের বক্তব্যই হচ্ছে তাই। তা বাস্তবকে অবলম্বন করে অতিবাস্তবের ব্যঞ্জনা বা ব্যঙ্গ্য সৃষ্টি করবে। এ কাজ তো শুধু অলঙ্কার উপমা দিয়ে হচ্ছেনা। যেমন, শুধু গয়না দিয়েই লাবণ্য সৃষ্টি হচ্ছেনা। অলঙ্কারহীনা শুভ্রবসনা বিধবারও সৌন্দর্য আছে, লাবণ্য আছে, তেমনি আবার অলঙ্কারহীন বাক্যও কাব্য হতে পারে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এই দুটি নিতান্ত সাধাসিধা নিরলঙ্কার বাক্য তাঁর মনে কি দোলা দিয়েছিল 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক নিশ্চয়ই তা জানেন। এই বাচ্যাতিরিক্ত শব্দার্থের অতীত ব্যঞ্জনাই কাব্যের আত্মা। তাই সেই জন্যেই ধ্বনিবাদীরা বলেন—ধ্বনিই কাব্যের আত্মা, 'ধ্বনিতাত্মা কাব্যস্য' ॥

কিন্তু খুব সহজে এমত প্রতিষ্ঠা পায়নি। দেহকেই যাঁরা সৌন্দর্যের মূল বলে বিবেচনা করেন, অর্থাৎ কাব্যবিচারে দেহবাদী যাঁরা, তাঁরা বলেন 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে যাকে নিয়ে আমরা এত নাচানাচি করছি, তা আসলে কিছুই নয়। বাক্যকে সুন্দর করে বল, তাকে অলঙ্কৃত কর—আপনিই তাতে বাচ্যার্থের অতীত জিনিষ জন্মাবে। এঁরা অলঙ্কারবাদী। এঁদের মতে কাব্যে অলঙ্কার সুপ্রযুক্ত হলে তাই হবে আনন্দদায়ক। কিন্তু এ মত যে যুক্তিযুক্ত নয় তার সম্বন্ধে ধ্বনিবাদীরা যা বলেছেন তা আগেই বলেছি ॥

তখন আরেকদল আলঙ্কারিক এই মতটাকেই একটু শুধরে নিয়ে বললেন কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি বা স্টাইল। বামন এই 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'-মতবাদের প্রধান প্রবক্তা। তিনি বলছেন, কী বলব সেটাই বড় কথা নয়, কেমন করে বলব সেটাই আসল। এ কথাটায় কিছুটা সত্যি আছে—কারণ সত্যিই পৃথিবীর অনেক নামজাদা কবি এই বলবার কায়দার গুণেই সমাদর পেয়েছেন। আমাদের ভারতচন্দ্রের প্রধান গুণই হচ্ছে তাঁর কায়দা বা স্টাইল। রীতিবাদীরা বলেন, এই স্টাইলই হচ্ছে কাব্যের আসল জিনিষ আর অলঙ্কার এই স্টাইল সৃষ্টি করার প্রধান উপকরণ। কাব্যের

আত্মা ধ্বনি বা বাচ্যার্থের অতীত কিছু বলে একদল ধ্বনিবাদী যা নিয়ে বাজার গরম করছেন, সেটা হয় কাব্যে ব্যবহৃত অলঙ্কার ও রীতির মধ্যেই আছে, নতুবা প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ। মনোরথ নামে এক রীতিবাদী ধ্বনিবাদীদের সুস্পষ্টভাবে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম জিনিষ বলে কিছুই নাই, যার রচনায় নাই চতুর বচনবিন্যাস, যার অর্থে অলঙ্কার নাই, তাকেই, কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো—নিতান্তই গতানুগতিকতার খাতিরে তাকে জড়বুদ্ধি লোকেরা ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে প্রশংসা করেছে—কারণ নো বিদ্মোহভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ—বুদ্ধিমান লোকের কাছে ধ্বনির স্বরূপ কেউ বুঝিয়ে বলতে পেরেছে, এমন ত দেখতে পাওয়া যায় না ॥

ধ্বনিবাদীরা তার উত্তরে বলেছেন, স্টাইল বা রীতিই যদি কাব্যে প্রধান হয় তাহলে বৈচিত্র্যই কাব্য হত। খোঁড়া মানুষ তার খঞ্জত্ব লুকানোর জন্যে যে বিশেষ ভঙ্গীতে বা স্টাইলে হাঁটে, টেকো লোক মাথার পিছনের চুলগুলিকে সামনে এনে বিচিত্রভাবে যে কেশবিন্যাস করে তাকেই তবে লোকে সুন্দর বলত। এতে চাতুর্য প্রকাশ পায় কিন্তু মাধুর্য সৃষ্টি হয়না। লোকে এদের দেখে বলে—'লোকটা কি চালাক দেখেছ! পা খোঁড়া, কিন্তু এমনভাবে হাঁটছে যেন লোকে ধরতে না পারে!' তেমনি স্টাইলও সৌন্দর্য নয়, চতুরতা মাত্র, তার দ্বারা বাচ্যের অতীত কিছু প্রকাশ করা যেতে পারেনা। আর মনোরথ যে বলেছেন, ধ্বনি কি তা কেউ বোঝাতে পারছেন না—এর উত্তর হচ্ছে এই যে ধ্বনি ত ব্যাকরণ বা অভিধান নয় যে এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকলেই সব বোঝা যাবে, বা অঙ্ক নয় যে কষে দেখিয়ে দেওয়া যাবে। ধ্বনিটা হচ্ছে অনুভূতির ব্যাপার, কাব্যবোধ যার আছে, সেই বুঝতে পারবে কথার অতীত জিনিষটা কাব্যে কতখানি ॥

ধ্বনিবাদী, অলঙ্কারবাদী এবং রীতিবাদী—এই তিন দলের ঝগড়া বস্তুতঃ কাব্য-বিচারে বস্তুতান্ত্রিক ও ভাববাদীদের লড়াই। সতর্ক পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, এই তিন দলই কাব্যের উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে ঝগড়া করেননি, কিভাবে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যাবে তাই নিয়েই ঝগড়া করেছেন। আলঙ্কারিকরা বলছেন, কাব্যে খুব অলঙ্কার ব্যবহার কর, তবেই তা কাব্য হবে, অলৌকিক আবেদন সৃষ্টি করবে; রীতিবাদীরা বলছেন, সুন্দর করে বিচিত্র উপায়ে কথাকে বলবার চেষ্টা কর—

কাব্য নিশ্চয় মহান আবেদন পাঠকের মনে আনবে ; ধ্বনিবাদীরা বলছেন, যদি বাক্যের অতীত 'ধ্বনি' কাব্যে না থাকে, তবে সে জিনিষ আর যাই হোক কাব্য নয় ॥

এই তিন দলের বিতর্কে সবচেয়ে বেশি যাঁদের কথা আমাদের মনকে প্রভাবিত করে, তাঁরা ধ্বনিবাদী। সত্যি কথা, বাক্যের অতীত একটা ব্যঞ্জনা যদি আমাদের মনে সৃষ্টি না হয়, যদি কাব্য 'ধ্বনি' সৃষ্টি করতে না পারে তবে তাকি কখনও আমাদের মনে লাগে! তাহলে তো ভারতচন্দ্রকে আমরা চণ্ডীদাসের চেয়ে বড় কবি বলতাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছেড়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছুঁতামও না! কিন্তু কার্যতঃ হয়েছে বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাষার অতীত তীরে যে ভাবের স্বর্গলোককে আমরা চেনা অচেনার অস্পষ্ট কুয়াসায় অপূর্ব রহস্যময় বলে দেখি— তা তো আসলে ধ্বনি সৃষ্টির জন্যে ॥

সে 'ধ্বনি' কিসের ? সে আবেদন কিসের ?

ধ্বনিবাদীরা বলেন সে আবেদন 'রস'-এর ॥

।। রস ।।

ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'যে হৌক সে হৌক বাক্য, কাব্য রস লয়ে।' রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, সাহিত্যে যা আনন্দের সামগ্রী তা-ই রসের সামগ্রী ॥

এতে এটুকু বোঝা গেল রসসৃষ্টি যদি না হয় তবে সে কাব্যে মূল্যবান কিছু নেই। কিন্তু কি করে বুঝব সাহিত্যে রস সৃষ্টি হল ॥

ছোট ছেলেকে একটা সন্দেশ খেতে দেওয়া হয়েছে। সে হয়ত জানে, কিংবা বুঝিয়ে দিলে বুঝবে, ঐ সন্দেশটা তৈরী হয়েছে ছানা চিনি বাদাম পেস্তা ইত্যাদি দিয়ে, কিন্তু সন্দেশটা যখন সে খাবে এবং খেতে যদি তার ভাল লাগে তবে যে আনন্দ সে পাবে, সেটা ছানা চিনি বাদাম পেস্তা খাওয়ার আনন্দ নয়—তার অতিরিক্ত একটা আনন্দ। সেই আনন্দই রসোপভোগের আনন্দ ॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শেক্সপীয়ারের নাটক যখন আমরা পড়ি, নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন দেখি, খাজুরাহোর পর্বতগুহায় খোদিত পাষাণমূর্তিগুলির সঙ্গে যখন চাক্ষুষ পরিচয় হয়—তখন কবিতার শব্দ বাক্য, ছবির রংরেখা, ভাস্কর্যের

মাটি পাথর—সব মন থেকে মুছে যায়; সেই কথা, শব্দ, রং, রেখা, সুর, ছন্দের অতীত একটি ব্যঞ্জনা মনে জাগে এবং সেই ব্যঞ্জনাই সৃষ্টি করে মনে একটি অলৌকিক আনন্দ। এই আনন্দের অনুভূতিই রসের অনুভূতি॥

সাহিত্যে এই আনন্দই প্রধান। কবিগুরু বাল্মীকি রামায়ণ লোকশিক্ষার জন্যে রচনা করেননি, করেছেন আনন্দ উপভোগের জন্যে- -আমরা সেটাকে লোকশিক্ষার কাজে লাগাই। 'কবির নির্ভর অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটা বেদনাময় চৈতন্য নিয়ে জন্মিয়ে থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়েই মানবপ্রকৃতি এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা করেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আচরণের মধ্যে দিয়ে কেবল মাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংশ্রবে যা অনুভব করবেন', তার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ না থাকলেও, তিনি বাস্তবকেই অবলম্বন করে যে অবাস্তব আনন্দের সৃষ্টি করবেন, তাই হবে রসসৃষ্টির হেতু। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে রসসৃষ্টির পদ্ধতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন॥

তাহলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কাব্যপাঠের পর আমাদের মনে যে একটি অপূর্ব ভাব বা অনুভূতি জাগছে তাকেই আমরা রসাস্বাদ বলছি। সাহিত্য যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তাকেই বলে 'রস'। রস ও কাব্যের জগৎ, অলৌকিক মায়ার জগৎ। যে জগতে আমরা বাস করি, যাকে আমরা বলি লৌকিক জগৎ, সেই জগতের শোক, আনন্দ, বিষাদ, ভয় প্রভৃতির কত ব্যবহারিক কারণ মানুষের মনে দুঃখ বেদনা আনন্দ সৃষ্টি করে। পুত্রের জন্ম একটি ব্যবহারিক কারণ, তাতে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ পাই; মাতার মৃত্যুতে পাই দুঃখ। এই সমস্ত লৌকিক কারণ যখন অনুভূতিময় কবির হাতে অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই তা আমাদের মনে রসের সৃষ্টি করে॥

একটা উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। বাল্মীকি মুনি দেখতে পেলেন দুটি ক্রৌঞ্চ মিলন-আনন্দে ব্যাকুল। এই মিলনক্ষণে এক নিষাদ তাদের একটিকে নিষ্ঠুর শরাঘাতে নিহত করল—ক্রৌঞ্চী হাহাকার করে প্রিয়তমের মৃতদেহের চারিদিকে উড়ে বেড়াতে লাগল। সমস্ত ঘটনাটি ব্যবহারিক জগতের ঘটনা—পাখীর মিলন, নিষাদের নিষ্ঠুর শরনিক্ষেপ এবং পাখীদের একটির মৃত্যু—

সবই লৌকিক ব্যাপার। কিন্তু এই ঘটনাটির দ্রষ্টা কবি যখন বলে উঠলেন "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং অগমঃ শ্বাশ্বতী সমা" ইত্যাদি তখন সেই কথাটি কবির কথা বলে শ্লোকত্ব পেল। কবির নিজের মনে হয়ত তখন বিষণ্ণতা ছিল তাই ক্রৌঞ্চের মৃত্যু দেখে তিনি শোক পেলেন; নিজের শোক এবং ক্রৌঞ্চীর শোক তখন এক হয়ে গেল—কিন্তু শ্লোকটি যখন নির্গত হল তখন তার মধ্যে নিজের শোকের কথা নাই, ক্রৌঞ্চীর শোকের কথাও নাই—আছে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানুষের ঘনীভূত শোকের ভাব। এতে আমাদের চোখে জল এলেও মনে একটি অপূর্ব আনন্দ-অনুভূতি জাগল। শোকের ঘটনা একটি করুণ রসের প্লাবনে আমাদের মনকে ভিজিয়ে দিল। ক্রৌঞ্চহত্যার দৃশ্য দেখে কবির মনে যে Saddest thought জেগেছিল, তা-ই Sweetest song-এ পরিণত হল॥

আরও একটি উদাহরণ দিই। পিতা যখন প্রথম পুত্রের জন্ম সংবাদ পান তখন নিশ্চয় আনন্দ অনুভব করেন। সেটা তাঁর নিতান্তই লৌকিক ব্যক্তিগত আনন্দের ব্যাপার, তার সঙ্গে অন্য কিছুর সম্বন্ধ নাই, অন্য লোকেরও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু রঘুবংশম্ কাব্যে দিলীপ যখন রঘুর জন্মের সংবাদ শুনছেন তখন কালিদাস তাকে বর্ণনা করেছেন—

জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি॥

তখন এই শ্লোকগুলির মধ্য দিয়ে যে হর্ষ ও আনন্দ প্রকাশিত হচ্ছে তা কবির নয়, দিলীপেরও হর্ষ নয়; সমস্ত মানুষের হর্ষকে কবি আস্বাদ্যমান রসরূপে পরিণত করেছেন। ইতালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ এই লৌকিক ভাবের কাব্যের রসে রূপান্তরের কথাটি সুন্দরভাবে বলেছেন—

" . Poetic idealization is not a frivolous embelishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the Serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure Poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts."

রসানুভূতি জিনিষটাই যে অলৌকিক তা আগে বলা হয়েছে—কিন্তু কেন তা অলৌকিক ? সমগ্র কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ পড়ে হয়ত কারো মনে কোন অনুভূতিই জাগল না, তাঁরা বুঝতেই পারলেন না কবি কি বলতে চাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারবেন না এই কারণে যে বাইরের জগতে আমাদের চারপাশে যে সমস্ত ঘটনা আমরা দেখি ও সেই ঘটনাগুলিকে আমরা যেভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করি, কবির রসানুভূতি ঠিক সেই রকম নয়, তা সৌন্দর্যের অনুভূতি। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ লোক কি করে ? সে কোন একটা ঘটনা দেখলে সেটাকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রমাণ ইত্যাদির সাহায্যে একটা সত্যে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তার সাহায্যেই সে ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি রচনা করে, বক্তব্যের প্রামাণ্য নির্ধারণই তার তখন প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতেই তার সমস্ত ক্ষমতা ব্যয়িত হয়ে যায়॥

এই জিনিষটি উল্লেখ করে আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন, যেখানে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের মধ্যেই লেখকের সমস্ত শক্তি খরচ হয়ে যায় সেখানে চিত্ত ত অব্যাহত মুক্ত আনন্দ লাভ করতে পারে না ! রসানুভূতি জিনিষটাই হচ্ছে 'সন্তানবৃত্তি বিশিষ্ট'— তার ধর্ম বিস্তারলাভ করা। যেখানে এই বিস্তারলাভ ঘটবে না, মন বাধা পাবে, সেখানে চিত্তের আকাশও ছোট হয়ে আসবে। লৌকিক জ্ঞানেই যদি আমাদের চিত্ত সন্তুষ্ট থাকে, তবে কি করে আমরা বিস্তৃত উদার চৈতন্যের পরিচয় পাব ! সুতরাং এই কথাটি বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, মনের বিস্তারশক্তিহীন, কেবলমাত্র লৌকিক প্রমাণজ্ঞানসম্বল মানুষের রসদৃষ্টি থাকতে পারে না। আমাদের এক শিক্ষকমশাই যেমন রবীন্দ্রনাথের বা যে-কোন কবির কবিতা হাতে এলেই দেখতেন তার বানানগুলি ঠিক আছে কিনা।—যে কবির রচনায় বানান-ব্যাকরণ ঠিক আছে, তাকেই তিনি বড় কবি বলতেন। এই রকম লোকই সংসারে বেশি, এরা কি করে কাব্যের রস আস্বাদন করবে ! বেশির ভাগ লোকই এরকম এই কথাটি আলঙ্কারিকরা জানতেন বলেই তাঁরা বলেছেন 'রসানুভূতি অলৌকিক'॥

রসানুভূতির আরেকটি বিশেষত্ব এই যে, তা লৌকিক সুখ দুঃখ ভয় আনন্দ থেকে শুধু আলাদাই নয়, লৌকিক প্রমাণজ্ঞান থেকেও পৃথক। লৌকিক সুখ দুঃখ তো নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কবি এই লৌকিক সুখ দুঃখকে অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাকে তিনি বীজ আকারেই রাখেন মহীরূহের সম্মান দেন না। বীজ

থেকেই মহীরূহ জন্মায়, কিন্তু মহীরূহ বীজ নয়। তেমনি লৌকিক আনন্দ থেকেই কাব্যের আনন্দ জন্মায় কিন্তু সেই আনন্দ লোকোত্তর। এরকম হওয়ার কারণ সাধারণ লোকের চিৎশক্তি কোথাও পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না, পেতে পারে না। সে নিতান্ত লৌকিক সুখ দুঃখ সত্য মিথ্যার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—কোথাও বা সে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক কোথাও বা সে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু এই সব বিঘ্নের আবরণ সরিয়ে যদি সে বাধাহীন উন্মুক্ত আনন্দের উপলব্ধি করতে পারত তবেই সে রসের আস্বাদনও লাভ করতে পারত। তাতে লৌকিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। কবিরা ছাড়া আর কারো পক্ষে তা সহজ নয় বলেই রসানুভূতিকে লোকোত্তর বলা হচ্ছে॥

রস প্রত্যক্ষসদৃশ, কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়। কথা শুনলে প্রথমে আমরা খুঁজি তার অর্থ, অর্থের অতীতে যা তা দেশকালাতীত। দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে মৃগয়ার মোহে পথ ভুলে এসে পড়েছেন, তাঁর তীব্র নির্মম মূর্তি দেখে কোমলপ্রাণ আশ্রম-মৃগরা ছুটে পালাচ্ছে, মুনিরা দুই হাত তুলে বলছেন—ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ আশ্রম-মৃগোহয়ং, কাতরভাবে নিবেদন করছেন—

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাতোঅয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ॥

তখন সমস্ত জিনিষটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে যে প্রতীতি জন্মাচ্ছে তা অলৌকিক। যে মৃগশিশু রাজার নির্দয় হিংসার থেকে দূরে পালাচ্ছে, সে কোন বিশেষ মৃগশিশু নয়; তার ভয় না কবির, না মৃগশিশুর, এমনকি শত্রুরও নয়। এই মানসপ্রতীতি আশ্রমের দেশ এবং ঘটনার কালের অতীত একটি অলৌকিক প্রতীতি। তাই এ জিনিষ সাহিত্যের সামগ্রী, অতএব রসের সামগ্রী। সেইজন্যই সাহিত্য বিচারের শেষ কথা—'রসাত্মকং বাক্যং ইতি কাব্যম্'॥

ভরতমুনি বলেছেন, বিভাব, অনুভাব আর ব্যভিচারী এই তিনটি 'ভাব' রসের সঞ্চারী।

যা ভাবের কারণ বা হেতু বা নিমিত্ত, যার থেকে বহু অর্থ বিজ্ঞাপিত হয় তাকে বলে 'বিভাব'।

বিভাব দুই রকম—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন বিভাব। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয়ের আলম্বন বা আশ্রয়—এই ভাবটি আলম্বন বিভাব, আর মলয়, চন্দ্র, পুষ্প ইত্যাদি প্রেমকে উদ্দীপ্ত করে—সেটা উদ্দীপন বিভাব।

ভাবের অর্থ আসে বিভাব থেকে আর ভাবের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে অনুভাব। চুম্বন, আলিঙ্গন, কটাক্ষ ইত্যাদি ভাবের অস্তিত্ব বোঝায়, তাই এদের বলা হয় অনুভাব।

ব্যভিচারী হচ্ছে সেই সমস্ত ভাব, যা স্থায়ী নয়। যেমন গ্লানি, শঙ্কা, ক্ষোভ ইত্যাদি।

এখানে যে 'ভাব' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে একটা স্থায়ী চিত্তবৃত্তি—আমাদের Instinct-এর মত।

ভরতমুনি আটটি স্থায়ী ভাবের কথা বলেছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এর সঙ্গে কোন কোন আলঙ্কারিক যোগ করেছেন শম।

Instinct থেকে যেমন Emotion তেমনি ভাব থেকে রসের সঞ্চার। প্রত্যেকটি ভাবের আনুষঙ্গিক একটা করে রস আছে। রতি থেকে শৃঙ্গার, হাস থেকে হাস্য, শোক থেকে করুণ, ক্রোধ থেকে রৌদ্র, উৎসাহ থেকে বীর রস, ভয় থেকে ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস, বিস্ময় থেকে অদ্ভুত ও শম্ থেকে শান্ত রসের সঞ্চার। নবম শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক রুদ্রট এই নয়টির সঙ্গে আরেকটি রস যোগ করেছেন প্রেয়ান্—এটি বৈষ্ণবদের 'সখ্য' রসের সগোত্র। এই ন'টি ভাব কাব্যের বিভাব অনুভাব ব্যভিচারের সংস্পর্শে নয়টি বা দশটি ( রুদ্রটেরটা ধরলে ) রসে পরিণত হয়। তবে মানুষের নয়টি ভাবই সব নয়—এছাড়াও নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ ইত্যাদি আরো চব্বিশটি, মোট তেত্রিশটি ভাবের কথা আলঙ্কারিকরা বলেছেন। তবে এই নয়টি ভাবই স্থায়ী এবং তাদের আনুষঙ্গিক নয়টি রসই কবির কাব্যে প্রাধান্য পায়॥

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY, AGARTALA, TRI
৪২০৫৭
2.1.87
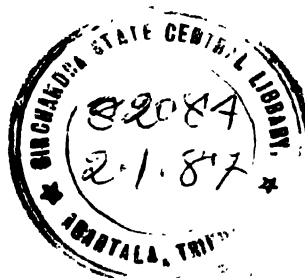
# ॥ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ॥

কাব্যে ধ্বনি এবং ধ্বনির সাহায্যে রসসৃষ্টি কবির প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলেও তিনি অলঙ্কার এবং রীতিকে বাদ দিতে পারেন না।• সুন্দর রান্নায় যেমন পরিমিত ভাল মশলারও প্রয়োজন, শুধু র‍াঁধুনীর কেরামতি থাকলেই চলবেনা, তেমনি ধ্বনি এবং রসসৃষ্টির উপকরণ—রীতি এবং অলঙ্কারকেও তিনি একদম বর্জন করতে পারেন না। এমন কোন কবি পৃথিবীতে নাই যিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটিও অলঙ্কার তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেননি, বা নিজের বক্তব্যকে বিশেষ রীতিতে বলেননি ॥

অলঙ্কার এবং রীতির ব্যবহার তাই ধ্বনিবাদী এবং রসবাদীরা স্বীকার করেছেন ॥ কোন বাক্য যখন আমরা শুনি তখন দুটি জিনিষ আমাদের মনে লাগে—একটি বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির শব্দ বা Sound, অন্যটি সেই বাক্যের অন্তর্গত পদসমষ্টির অর্থ। শব্দ বা Sound বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা গ্রহণ করি আর অর্থকে স্বীকার করি মন দিয়ে। কবিরা তাঁর কাব্যকে মনোহর করার জন্যে যেমন শব্দগুলিকে অলঙ্কৃত করেন, তেমনি অর্থকেও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তাতেও রঙ লাগান। তাই শব্দের Sound এবং শব্দের অর্থ ( meaning ) এই দুটিকেই আশ্রয় করে যে সমস্ত অলঙ্কার কবিরা ব্যবহার করেন আলঙ্কারিকরা তাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। একটিকে বলে শব্দালঙ্কার অন্যটিকে বলে অর্থালঙ্কার ॥

শব্দের ধ্বনি বা Sound কে অবলম্বন করে যে অলঙ্কার প্রযুক্ত হয় তাকে বলে শ ব্দা ল ঙ্কা র। এই অলঙ্কার ধ্বনি বর্ণ, পদ এবং কোথাও বা সমস্ত বাক্যটিকে আশ্রয় করেও উৎপন্ন হতে পারে।

491.446
M-234 A(20)

আর একান্তভাবে অর্থের ওপর নির্ভরশীল যে অলঙ্কার, অর্থ বোঝাচ্ছে এমন শব্দালঙ্কারসমন্বিত পদ উঠিয়ে দিয়ে সেখানে সমার্থক অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলঙ্কার অর্থে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাকেই বলব অ র্থা ল ঙ্কা র। শব্দালঙ্কারসমন্বিত পদসমষ্টির দ্বারা অর্থালঙ্কার সৃষ্টি হতে পারবে, কিন্তু অর্থালঙ্কারের দ্বারা শব্দালঙ্কার আরোপ করা যাবে না।

এই দুই ধরণের অলঙ্কারের আবার নানা ভাগ আছে। এখন সেইগুলি আলোচনা করে দেখা যাক॥

## ॥ শব্দালঙ্কার ॥

প্রথমে শব্দালঙ্কার। কারণ শব্দের আবেদন প্রথমেই আমাদের কানে।

অনুপ্রাস—শব্দালঙ্কারের প্রথম জিনিষ অ নু প্রা স। একটা বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যদি বারবার বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তাকে বলে অ নু প্রা স। এই বর্ণটি বা বর্ণগুচ্ছ যুক্তভাবেও ব্যবহার করা যাবে, আলাদাভাবেও ব্যবহার করতে বাধা নাই। যেমন—

মৃদু বায়ুহিলোল বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে —রবীন্দ্রনাথ।
কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ —বাংলা ছড়া।
চল চপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ —রবীন্দ্রনাথ।
বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে —যতীন্দ্রনাথ।

প্রথম উদাহরণে 'ল' বর্ণটি নয়বার, দ্বিতীয়টিতে 'ক' বর্ণটি দশবার, তৃতীয়টিতে 'চ' বর্ণটি ছয়বার এবং শেষ উদাহরণটিতে 'ব' বর্ণটি পাঁচবার ব্যবহৃত হয়ে বাক্যগুলিকে একটি বিশেষ ধ্বনিমাধুর্য দিয়েছে।

যুগ্ম বর্ণও সেই রকম অনুপ্রাস হিসাবে ব্যবহার হতে পারে—

শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লব পুঞ্জে। —রবীন্দ্রনাথ।
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল —ঐ
শ্রান্তদেহ, ক্লান্ত মন, শান্তি মাগে প্রতি অঙ্গ মোর। —অ. ম.।
লভে ইষ্ট সিদ্ধি গোঁপ বৃদ্ধি যে চায় সমৃদ্ধি
কালো কি কটা। —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, যতগুলি উদাহরণ দিলাম, সবগুলিতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই এককভাবে হোক, সংযুক্তভাবেই হোক অনুপ্রাস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে স্বরবর্ণকে কি অনুপ্রাস হিসাবে কবি প্রয়োগ করতে পারবেন না। কোন কোন

আলঙ্কারিক বলেন, বারবার স্বরবর্ণ উচ্চারণ করলে খুব একটা ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না এবং সেইজন্য স্বরবর্ণের অনুপ্রাসকে অনুপ্রাস বলা যাবে না। কিন্তু যদি ইংরেজিতে Vowel Soundকে অনুপ্রাস হিসাবে আধুনিককালে স্বীকার করতে কোন বাধা না থাকে, তবে বাংলাতেই বা দৃষ্টিভঙ্গী পালটাবো না কেন। সুতরাং—

দায়িত্বপূর্ণ লেখনী আসার আত্মপ্রকাশের গরজে অস্থির নয় বলেই, তাঁর লেখা অল্পবিস্তর অসরল। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

এই বাক্যতে 'অ' ধ্বনির অনুপ্রাস স্বীকার করতে গোঁড়ামি না রাখাই উচিৎ।

অনুপ্রাসের তিনটি শাখা—অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্তানুপ্রাস এবং ছেকানুপ্রাস। আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তী ইংরেজির অনুকরণে আরেকটি অনুপ্রাসের কথা বলেছেন, সেটি আদ্যানুপ্রাস॥

কবিতার একটি চরণের শেষের শব্দটির সঙ্গে দ্বিতীয় চরণটির শেষের শব্দটির ধ্বনির মিল থাকলে তাকে বলা হয় অ ন্ত্যা নু প্রা স। যেমন—

আমার চলা যায় না বলা—
আলোর পানে প্রাণের চলা— —রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম চরণের শেষ ধ্বনি 'আ' ( বল+আ ) পরের চরণের শেষধ্বনি 'আ' ( চল+আ )-র সঙ্গে অনুপ্রাসিত। তেমনি আরো উদাহরণ ঃ

ধরা নাহি দিলে ধরিব দুপায়,
কি করিতে হবে বল সে উপায়,
ঘর ভরি' দিব সোনায় রুপায় —রবীন্দ্রনাথ।

জল পেয়ে প্রাণ পেয়ে উঠে তরু
শষ্পি উঠে তৃণভূমি বাষ্পি উঠে তপ্ত যত মরু।
মনে পেয়ে আশা
হাসি উঠে চাষা
মাঠময় বাজি উঠে ভেকের ডমরু॥ —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে'।
—জীবনানন্দ দাশ।

শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই
গ্রামে মানুষের এতটুকু দাম নেই।
কঠিন জীবন! তবুও প্রকৃতি তাকিয়ে প্রতীক্ষায়
তাই তো আমরা মিলেছি এ দীক্ষায়। —বিষ্ণু দে।

অন্ত্যানুপ্রাসে, বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে ব্যাকরণগত পার্থক্য থাকলেও, কবিতায় সে পার্থক্য গ্রাহ্য করা হয় না। তাই কবিতায় 'কর' এবং 'খর', 'ডাক' আর 'ঢাক' মিল দিতে বাধা নাই। আবার কবিতায় পর পর দুই লাইনের মিল ছাড়াও, লাইনের মধ্যে মধ্যে মিল দিলেও তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলতে বাধা নাই। ত্রিপদীর একটি চরণকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, চৌপদীকে চার ভাগে। ত্রিপদীতে প্রথম দুই পর্বের শেষে এবং চৌপদীতে প্রথম তিন পর্বের শেষে যে মিল দেওয়া হয় তাকেও অন্ত্যানুপ্রাস বলা হবে। যেমন—
ত্রিপদীতে :

সমধর্মাধর্ম সম কর্মাকর্ম
ছোট বড় সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল॥ —ভারতচন্দ্র।

এখানে সমধর্মাধর্ম থেকে সমতুল পর্যন্ত একটি পঙক্তি। তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগের শেষ শব্দ ধর্ম এবং কর্মে মিল আছে। তেমনি দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'নাই' এবং 'ঠাঁই' অন্ত্যানুপ্রাস। আবার প্রথম পঙক্তির শেষ ধ্বনি 'তুল' অন্ত্যানুপ্রাসিত হচ্ছে দ্বিতীয় পঙক্তির শেষ শব্দ 'মূলে'র সঙ্গে। চৌপদীতে :

গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব

শালতাল-তরু সভয়-তবধ সব—

পন্থ বিজন অতি ঘোর ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে 'গগন সঘন' থেকে 'অতি ঘোর' পর্যন্ত একটি পঙক্তি। তাকে ভাগ করা হয়েছে চার ভাগে তাই এর নাম চৌপদী। প্রথম তিনটি পর্বের শেষের 'ভব' 'রব' এবং 'সব' পরস্পরের সঙ্গে অনুপ্রাসিত ॥

**বৃত্ত্যনুপ্রাস**—আসলে সব অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস কারণ একই ধ্বনি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ( বৃত্ত বা repeated হচ্ছে )। অষ্টম শতাব্দীর আচার্য উদ্ভট 'বৃত্তি' কথাটি অনুপ্রাসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন 'বলার ভঙ্গী' হিসাবে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে যে 'বৃত্তি' কথাটি পাই সেটির তাৎপর্য অর্থতত্ত্বের দিক দিয়ে। এই দুইটি বৃত্তিকে পরে মিলিয়ে নিয়ে অর্থ করা হল রসের আনুগত্য। তাহলে বৃত্ত্যনুপ্রাসের আলঙ্কারিক সংজ্ঞা দাঁড়াচ্ছে রসানুগত অনুপ্রাস।

বৃত্ত্যনুপ্রাসে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ একাধিকবার, একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বহুবার, ব্যঞ্জনগুচ্ছ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুচ্ছ স্বরূপ অনুসারে একাধিকবার ধ্বনিত হয়। ক্রমান্বয়ে উদাহরণ :—

আঁধারের বুকে বাঁধা বেগহীন মেঘ —অ. ম.।

এখানে 'ধা' ধ্বনি দুবার এবং 'গ' ধ্বনি দুবার ব্যবহৃত।

অন্যান্য উদাহরণ :

বঞ্জুল বনে মঞ্জু মধুর কলকণ্ঠের তরল তান

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

ব, ম, ত প্রত্যেকটি দুবার করে ব্যবহৃত।

নব নীপ বনে মঞ্জীর ধ্বনি,
চকিত চরণে চলিছে রমণী,
আকুল আবেগে পল গণি' গণি'
আঁধার মধ্যরাতে ॥ —অ. ম.।

এখানে 'ন' ধ্বনি চারবার, 'চ' তিনবার, 'আ' দুবার এবং 'ণ' দুবার করে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি
ক্ষীণ কটি তটে গাঁথি লয়ে পর করবী। —রবীন্দ্রনাথ॥

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
চলে না চল মলয়ানীল বহিয়া ফুলগন্ধভার। —কালিদাস রায়।

কুঞ্জরগতিগঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।
ঘনগঞ্জনচিকুর-পুঞ্জ মালতীফুলমালেরঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতিহারী॥ —জগদানন্দ।

দুটো কিংবা তার বেশি বর্ণগুচ্ছ যদি পর পর মাত্র দুবার ধ্বনিত হয় তবে তাকে বলা হবে ছে কা নু প্রা স।

লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে —মধুসূদন।

এখানে ঙ্ক দুবার ক্রম অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্যান্য উদাহরণ :

(ক) এখনই অন্ধ বন্ধ কোরনা পাখা। —রবীন্দ্রনাথ।
(খ) 'যত্ন কর, রত্ন পাবে'—দিলেন উপদেশ। —অ. ম.।
(গ) তারা বুঝি দৃষ্টিহারা বৈশাখীর ঢেউ, হাওয়া মেঘ —বিষ্ণু দে।
(ঘ) উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া। —রবীন্দ্রনাথ।
(ঙ) বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।
—রবীন্দ্রনাথ।

ছেকানুপ্রাস এবং বৃত্তানুপ্রাস জিনিষটায় তফাৎ শুধু একটি ব্যাপারে। বৃত্তানুপ্রাসে একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ক্রমানুসারে পরপর বহুবার ধ্বনিত হয় আর ছেকানুপ্রাসে হয় মাত্র দুবার॥

আচার্য শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন আরেকটি অনুপ্রাসের কথা। নাম দিয়েছেন আ দ্যা নু প্রা স। তিনি Stephen Phillips লিখিত একটি ইংরাজী

কবিতার একটি স্তবক উদ্ধৃত করে জিনিষটা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। স্তবকটি এই—

> Crude daubs that cavemen would have scorned
> Yet fools conspired to praise,
> Rude verse less rhythmic, more uncouth, than pristine
> Bardic lays.

এই স্তবকটিতে অন্ত্যানুপ্রাস praise এবং lays। আবার প্রথম পঙক্তির প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দের সঙ্গে মিল দেওয়া। এখানে প্রথম পঙক্তির প্রথম শব্দ crude-এর দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দ rude-এর মিল আছে। একেই তিনি বলেছেন আ দ্যা নু প্রা স।

বাংলায় আধুনিক কবিরা এরকম আদ্যানুপ্রাসের ব্যবহার অনেক করেছেন। আচার্য চক্রবর্তী বররুচির একটি ছত্র তুলে আদ্যানুপ্রাসের চমৎকার প্রয়োগ দেখিয়েছেন—

> ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
> বিতর তানি সহে চতুরানন।
> অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
> শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

এখানে প্রথম পঙক্তির 'ইতরতা'-র সঙ্গে দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথম শব্দ 'বিতরতা-র মিল আছে।

আদ্যানুপ্রাসের অন্যান্য উদাহরণ ঃ—

> যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
> যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল॥ —রবীন্দ্রনাথ।

> যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির বাটে
> ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে। —রবীন্দ্রনাথ।

> হাঁকিয়ে দিয়ে মেঘের ঘোড়া আসছে তেড়ে ঝড়,
> তাকিয়ে আছে সভয় চোখে বিশাল দিগন্তর। —অ. ম.।

অনেক সময় একটি শব্দ বার বার একই স্তবকের মধ্যে একই অর্থে ব্যবহার করে অনুপ্রাস সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন—

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি ॥
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায় জাগে পরম বাণী ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

ঘুম নাই ভাই ঘুম নাই মোর
নয়নে মধুর ঘুম নাই! —অ. ম.।

কতো কাল ধরে করে যায় এরা কতো না আত্মদান
কতো বিদ্রোহ, কত ফাঁসি, কত আন্দোলনের গান
মরণের কানে করে গেছে এই অমর্ত্য ছেলেরা যে
কতো বীরবেশে জীবনকে এরা করেছে মাল্যদান
সে কী নির্ভয় বাঁশিতে মেলানো বাজে। —বিষ্ণু দে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে —জীবনানন্দ দাশ।

মধুর মধুর মধু বঙ্গ,
মধু-রস-গঙ্গা মধুর-তরঙ্গা সুন্দর শ্যামরস-অঙ্গ।
মধুর শৈলবন মধুর ক্ষেত্রঘনশস্যহরিত মধুকান্তি,
মধুর মধুর গুরু-গম্ভীর-অম্বর-ওঙ্কার-ঝঙ্কৃত-শান্তি।

মধুর চন্দ্র-রবি-রঞ্জিত মধু-রস-অঙ্গ,
মধুর জন্মভূমি মধুর কর্মভূমি মধুর মধুর মধু বঙ্গ ॥

—শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

যে পাঁচটি উদাহরণ উপরে দেওয়া হল তাতে দেখানো হয়েছে প্রথমটিতে 'তখন' শব্দটি, দ্বিতীয়টিতে 'ঘুম' শব্দটি, তৃতীয়টিতে 'কতো' শব্দটি, চতুর্থটিতে প্রথমে 'নয়' এবং পরে 'ক্লান্ত' শব্দটি এবং শেষটিতে 'মধুর' 'মধু' শব্দ দুটি বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে। কবি কখনও একটি বিশেষ বক্তব্যের ওপর জোর দেবার জন্যে একটি শব্দ বার বার ব্যবহার করতে পারেন, কখনও নিছক ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিও এর উদ্দেশ্য হতে পারে ॥

যমক—পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ আছে যার একাধিক অর্থ হতে পারে। একাধিক অর্থে সেগুলির ব্যবহারও হয়ে থাকে। Spot কথাটির মানে স্থানও হয়, চিহ্নও হয়। অঙ্ক মানে ক্রোড়, গণিতের আঁক, নাটকের অধ্যায়, চিহ্ন—বহু অর্থ হচ্ছে।

কবিরা তাঁদের কাব্যে বৈচিত্র্য আনবার জন্যে কিংবা নিতান্ত শব্দচাতুর্য দেখাবার জন্যে অনেক সময় একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে বহুবার ব্যবহার করেন। একটি শব্দ অনেকবার একই অর্থে ব্যবহার করার চেয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধির খেলা আছে। এই উদ্দেশ্যে একই শব্দ নির্দিষ্ট ক্রমে আলাদা আলাদা অর্থে অনেকবার ব্যবহার করলে তাকে আমরা বলি য ম ক ॥

যমক অলঙ্কার কবি যদি চতুরতার সঙ্গে কাব্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন তবে কবিতায় নিশ্চয়ই একটা আলাদা স্বাদ আসে। কিন্তু নেহাৎই যদি শব্দের ওপর দখল দেখানোর জন্যে কবি কাব্যরসসৃষ্টির দিকে না তাকিয়ে একে ব্যবহার করেন, তাতে অনেক সময় উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যমকের আকর্ষণ এমনই যে সংস্কৃতের বড় বড় ত বটেই বাংলাভাষার কবিরাও একে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

একটা পুরানো বাংলা কবিতায় পড়েছিলাম—

কুসুমের বাস ছাড়ি কুসুমের বাস
বায়ুভরে এসে করে নাসিকায় বাস।

এখানে বাস শব্দের যথাক্রমে অর্থ—বাসস্থান, সুগন্ধ ( সুবাস থেকে ), এবং অবস্থান। মানেটা দাঁড়ালো এই, কুসুমের বাসস্থান ছেড়ে কুসুমের সুগন্ধ বাতাসে

ভর করে নাসিকায় অবস্থান করল। কবি বাস শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু একি কাব্য হল!

বিদ্যাপতির মত একজন সুকবিও এই যমকের মোহ ছাড়তে পারেননি। তিনি একজায়গায় বলছেন—

সারঙ্গ নয়ন বচন পুন সারঙ্গ
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ
কেলি করই মধুপানে॥

এখানে সারঙ্গ শব্দটির পর পর অর্থ—হরিণী, কোকিল, ফুলশর, কমল, মধুকর।

বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায় বহু যমক ব্যবহার করেছেন সেগুলিতে তাঁদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্যরসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রকম কয়েকটি যমক—

প্রভাকর প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা। —ঈশ্বর গুপ্ত।

ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে —ভারতচন্দ্র।

আমার কাজ কি বাসে কাজ কি বাসে
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে যার হৃদয়ে বাসে
সে কি বাসে বাস করে? —দাশরথি রায়।

তবে কৌতুকরস সৃষ্টির জন্য এই অলঙ্কারটি মন্দ নয়। যেমন—

সর্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম নিয়ে, শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম জ্ঞান। — রবীন্দ্রনাথ।

ক্রিয়াকর্ম=আচার অনুষ্ঠান; ব্যাকরণের ক্রিয়া, কর্ম।

অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি;
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি! —রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অবশ্য কাব্যরস সৃষ্টির জন্যও যমকের ব্যবহার কম নাই। একটি উদাহরণ—

ঘননীল বনে এসো ঘননীল-বসনা।

ঘননীল = গাঢ় নীল ; ঘননীল = মেঘের মত নীল।

আরেকটি সুন্দর ব্যবহার—

জীবে দয়া তব পরম ধর্ম 'জীবে' দয়া তব কই? —কালিদাস রায়।

জীবে = জীবের প্রতি। জীবে = জীব গোস্বামীর প্রতি।

**শ্লেষ**— একটি শব্দকেই বারবার পরপর নানা অর্থে ব্যবহারের কায়দাকে আমরা বলি যমক। কিন্তু এমনও হতে পারে একটা শব্দ কবি একবার মাত্র ব্যবহার করলেন, কিন্তু মানে হল দুটো আলাদা আলাদা জিনিষ। সেই ক্ষেত্রে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হল তাকে বলা হবে শ্লে ষ অলঙ্কার॥

কবি মধুসূদন প্রথম স্বদেশ ছেড়ে সাগরপারে বিলাতে যাচ্ছেন ব্যারিষ্টার হবার জন্যে। বিদেশ যাত্রার পূর্বে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন তাতে তিনি স্বদেশকে সম্বোধন করে বলছেন, মা, এই দাসকে তুমি মনে রেখো।

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে,<br>
সাধিতে মনের সাধ<br>
ঘটে যদি পরমাদ<br>
মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে॥

এই স্তবকটির শেষ পঙক্তির প্রথম শব্দ 'মধু' কথাটির একবার মাত্র ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু মানে হচ্ছে দুটো। তোমার মনপদ্মকে মধুহীন কোর না ; আর 'তোমার মন থেকে কবি মধুসূদনকে সরিয়ে দিও না।' এখানে মধু শব্দটিকেই শ্লেষ অলঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

একটি শব্দের মধ্যেই যদি শ্লেষের ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে থাকে তবে তাকে বলা হবে শ ব্দ শ্লে ষ।

শব্দশ্লেষের কয়েকটি উদাহরণ ঃ

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।<br>
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ॥ —ভারতচন্দ্র।

অতি বড় বৃদ্ধ—খুব বুড়ো, সকলের চেয়ে জ্ঞানী ও সম্মানিত॥ সিদ্ধি—নেশার জিনিষ, অষ্ট সিদ্ধি॥ কোন গুণ নাই—গুণহীন, সমস্ত গুণের অতীত॥ কপালে আগুন—পোড়া কপাল, শিবের তৃতীয় নয়ন, যে নয়নের আগুনে মদনদেব ভস্ম হয়েছিলেন।

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর। —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঈশ্বর্—ভগবান, কবি ঈশ্বরচন্দ্র॥ গুপ্ত—লুক্কায়িত, নামহীন॥ প্রভাকর—সূর্য, কবি সম্পাদিত পত্রিকার নাম॥

ঋতুতে ঋতুতে মহাকবি কাল নিভুর্ল নিয়মে তাঁর ঋতুসংহার কাব্য রচনা করে চলেন। —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঋতুসংহার—কালিদাসের অন্যতম কাব্য, ঋতুর ধ্বংস।

এনেছে তোমার পতি বাঁধি নিজগুণে —মকুন্দরাম।

গুণে—গুণের দ্বারা, ধনুকের ছিলার সাহায্যে॥

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ্

পূরবী—দিনের শেষ, রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্য গ্রন্থ।
রবির—সূর্যের, কবি রবীন্দ্রনাথের॥

কখনও কখনও একটা গোটা বাক্যেরই দুটো আলাদা অর্থ হতে পারে। সেখানে গোটা বাক্যটিকেই শ্লেষ অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে আলঙ্কারিকরা তাকে বলেছেন বা ক্য গ ত শ্লে ষ। তবে আমার মনে হয়, যে বাক্যে একটা শ্লেষ অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে, সেই শ্লেষ অলঙ্কারের অর্থটি শুধু সেই শব্দের মধ্যেই আটকে নাই, গোটা বাক্যটিকেই তা প্রভাবিত করছে। যেমন, যখন বলছি 'এনেছে তোমার পতি বাঁধি নিজগুণে' তখন 'গুণ' শব্দটির দুটি অর্থ ঐ গুণের মধ্যেই আটকে নাই, তা গোটা বাক্যটিকেই বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করার সুযোগ দিচ্ছে। সুতরাং একে বাক্যগত শ্লেষ বলতে বাধা কোথায় বুঝতে পারছিনা। তবু ভাগ যখন করা হয়েছে তখন ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহ রায় বাক্যগত শ্লেষ বোঝাতে যে উদাহরণটি তাঁর 'বাংলা অলঙ্কার' বইতে ব্যবহার করেছেন

সেটি এখানে তুলে দিয়ে, এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানি। ডক্টর সিংহ রায় উদাহরণ দিয়েছেন—

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥

শ্লেষ সম্পর্কে শেষ কথা এখনও হয়নি। আলঙ্কারিকরা শ্লেষ জিনিষটারই দুটি ভাগ করেছেন—সভঙ্গ আর অভঙ্গ॥

কবি এমন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন যাকে না ভাঙলে শ্লেষের প্রয়োগটা ধরা যাবেনা। রবীন্দ্রনাথের—

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে

বাক্যটির মূলতান শব্দটি শ্লেষ অলঙ্কার। মূলতান—পূরবীর নিকটবর্তী একটি রাগিণী; প্রধান তান বা সুর—এই দুই অর্থ এখানে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থ (প্রধান তান বা সুর) মূলতান শব্দটিকে ভাঙলে, মূল তান যা, তবে পাই।

এক্ষেত্রে এটি সভঙ্গ শব্দ শ্লেষ॥

আবার কোন একটি শব্দকে না ভেঙেই দুটি অর্থ পেতে পারি। আচার্য শ্যামপদ চক্রবর্তী একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন—

পূজা শেষে কুমারী বলল, 'ঠাকুর আমাকে একটি মনের মত বর দাও।'

এখানে বর শব্দটিকে না ভেঙে দুটি অর্থ—আশীর্বাদ এবং স্বামী—ধরতে কোন বাধা হচ্ছে না। এটি অভঙ্গ শ্লেষের নমুনা॥

বক্রোক্তি—বর্ধমানের বাঁদমুড়া গ্রামে এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম দাশরথি রায়ের। যৌবনকালে শাঁকাই-তে এক নীলকুঠির কেরানী হিসাবে কাজ করার সময় আকাবাই নাম্নী এক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি চাকরী বাকরী সব ছেড়ে ছুড়ে ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, খুললেন পাঁচালির দল। প্রথম প্রথম সবাই নিন্দা করলেও, পরে তাঁর খুব খ্যাতি হলো—ব্রাহ্মণরাও তাঁর প্রতিভার সম্মান করলেন।

দাশরথি যখন খ্যাতির মধ্য গগনে তখন শোনা যায়, শতঞ্জীব বিদ্যারত্ন তাঁকে বলেছিলেন, দাশু তুমি সিদ্ধ পুরুষ।

দাশরথি সিদ্ধ কথাটি অন্য অর্থে ধরে নিয়ে জবাব দিলেন, 'ব্রাহ্মণের বংশে জন্ম নিয়ে যখন পাঁচালির দল করেছি তখন আমি সিদ্ধ ছাড়া আর কি ! আপনারা সবাই আতপ, আমি আর এ জন্মে আতপ হতে পারলাম না।'

শতঞ্জীব সিদ্ধ অর্থে বোঝাতে চেয়েছিলেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ, তপঃসিদ্ধ কবি ইত্যাদি।

কিন্তু দাশু সিদ্ধ চাল যে অর্থে ধরা হয়, সেই অর্থে ধরলেন। সিদ্ধ চাল দেবপূজায় কাজে লাগে না, কাজে লাগে আতপ চাল। দাশুও তেমনি বলতে চান তিনি ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ নন।

দাশু বিদ্যারত্নের 'সিদ্ধ' কথাটির অর্থ বুঝতে পেরেও ইচ্ছা করেই, কৌতুক সৃষ্টির জন্যে, কথাটির অন্য অর্থ ধরে নিয়ে জবাব দিলেন।

একটা কথার যে-অর্থটা বক্তার জানবার ইচ্ছে, সেই অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি অন্য অর্থ ধরে নেন—তবে হয় বক্রোক্তি অলঙ্কার। বক্রোক্তির ২টি ভাগ। শ্লেষবক্রোক্তি এবং কাকুবক্রোক্তি॥

একটু আগেই শ্লেষ অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, একই শব্দের নানা অর্থে অলঙ্কার হিসাবে প্রয়োগ। যে বক্রোক্তিতে শব্দের অর্থগত বৈচিত্র বা শ্লেষ-ই প্রধান তাকেই বলা হবে শ্লেষ বক্রোক্তি। দাশরথি এবং শতঞ্জীব বিদ্যারত্নের কথোপকথনটি শ্লেষ-বক্রোক্তির একটি চমৎকার উদাহরণ, কারণ সেখানে 'সিদ্ধ' কথাটি শ্লেষ অলঙ্কার এবং সেই কথাটিই ঐ বক্রোক্তির প্রধান অবলম্বন॥

'কাকু' কথাটির মানে স্বরভঙ্গি। বক্তার কথা বলার সময়ে কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গীর সাহায্যে নিষেধাত্মক জিনিষ ইতিবাচক ( affirmative ) আবার ইতিবাচক শব্দ নিষেধাত্মক অর্থে প্রকাশিত হতে পারে। কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গীর ওপর নির্ভরশীল বক্রোক্তিকেই বলে কাকু বক্রোক্তি। যেমন,

> বজ্রে যে জন মরে,
> নব ঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে ?
>
> —যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

এখানে 'কেবা করে'র অর্থ, কেউ করে না। ইতিবাচক শব্দের দ্বারা নিষেধাত্মক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আরো উদাহরণ ঃ

পর্বতগৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,

কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি ? মধুসূদন।

অশ্বত্থের শাখা

করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভীড় এসে

সোনালী ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে

করেনি কি মাখামাখি ?

থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে

বলেনি কি ঃ বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে

চমৎকার !

ধরা যাক দু একটি ইঁদুর এবার !'

জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ? —জীবনানন্দ দাশ।

[ নিষেধাত্মক ভঙ্গীতে ইতিবাচক ব্যঞ্জনা ]

যন্ত্রণায় নীল স্নায়ু কান্নায় বিধুর চোখ মেলে

আমি কি দেখিনি মা অন্ধ্র কচ্ছ গুজরাটের

আসামের বাংলার মাঠে

নতুন বজ্রের জন্ম ? —অ. ম।

এই পরিণতির লোভে কি

জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে

কন্টক কিরীট প'রে, বিনা ধনুর্বেদে

হ'লে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট,

মৃত্যুর কবাট

খুলে রেখে, চলে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে ? —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

ব্যঞ্জনা ঃ এই পরিণতির লোভে খৃষ্ট জন্মাননি ॥

## ॥ অর্থালঙ্কার ॥

রমণীর কঙ্কণ, বাজু, চুড়ি, দুল, পায়ের মল যেমন বাইরের অলঙ্কার, তেমনি লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, নম্রতা এগুলিও তার শোভা বাড়ায়। একটি তাকে শোভাময়ী করে বাইরের দিক থেকে, আর অন্যটি তাকে শ্রীময়ী সৌন্দর্যময়ী করে ভিতরের দিকে। গুণবতী রমণীর হাতে সোনার বালার বদলে শাঁখা পরালেও তার ভিতরের গুণের কোন তারতম্য হয় না—কঙ্কন পরলেও সে দয়াবতী, সামান্য লাল সুতো হাতে দিয়ে থাকলেও সে দয়াময়ী।

বাক্যেরও তেমনি শোভা দুদিকের। একটি বাইরের দিকে—সেখানে আমরা শব্দকেই করি সজ্জিত, অনুপ্রাসে, যমকে, শ্লেষে, বক্রোক্তিতে তাকে আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে মনোহর করে প্রকাশ করি। বাক্যের আরও একদিকে শোভা—সেটি ভিতরের অর্থের। শব্দের গড়নের দিকে নজর না দিয়ে তার অর্থের শোভার দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে, আমরা বাক্যে শব্দকে ব্যবহার করতে পারি। তাতে শব্দের ধ্বনির দিকে মন না দিলেও চলে। এক শব্দের বদলে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করলেও আমরা বক্তব্যকে প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করি না, যেমন গুণবতী রমণীর গুণ প্রকাশ করার জন্য কঙ্কণের বদলে সাধারণ শাঁখাও ব্যবহার করতে পারি—কারণ বালা শাঁখা দুটোই বাইরের অলঙ্কারের কাজ চালিয়ে দিতে পারে, ভিতরের গুণকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে না।

বাক্যে শব্দকে কেবল অর্থের আশ্রয়ে গ্রহণ করে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকেই বলে **অর্থালঙ্কার** ॥

অর্থালঙ্কার সৃষ্টির জন্য শব্দের ধ্বনির ওপর জোর দেওয়া হয় না—দেওয়া হয় তার অর্থের ওপর। তাই এক শব্দের বদলে সেখানে সমার্থক অন্য শব্দ ব্যবহার করলেও অর্থাশ্রয়ী অলঙ্কারের কোন ক্ষতি হয় না।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই শরৎকালের দ্বিপ্রহরের একটা বর্ণনা দিয়েছেন। পূজার দীর্ঘ ছুটির পর গৃহস্বামী প্রবাসে কর্মস্থানে ফিরে যাচ্ছেন, দরজায় গাড়ী তৈরী, শরতের রোদ আস্তে আস্তে প্রখর হয়ে উঠেছে—দুপুরের বাতাসে জনহীন পল্লীগ্রামের পথে ধূলো উড়ছে,

একটা জীর্ণ অশ্বত্থ গাছের নীচে কাপড় বিছিয়ে একটি বৃদ্ধা ভিখারিনী গভীর ঘুমে মগ্ন। নিজস্ব নির্জন রৌদ্রালোকিত দুপুর। সেই দুপুর কি রকম ?

—যেন রৌদ্রময়ী রাতি

ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম।

রাত্রিতে যেমন সব নিস্তব্ধ নির্জন নিঝুম, খাঁ খাঁ রোদ্দুরের দুপুরও যেন তেমনি স্তব্ধ, জনহীন, নিঃশব্দ।

এই ভাবটি একটি বাক্যে প্রকাশিত। শব্দ আছে নয়টি। কিন্তু এই বাক্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বদলে যদি সমান অর্থবিশিষ্ট অন্য শব্দ ব্যবহার করি তবে এই বাক্যের অন্তর্নিহিত ভাবটি কি আমরা প্রকাশ করতে পারব না ? যদি বলি—

--যেন রৌদ্র-মাখা নিশা

খাঁ খাঁ করে চতুর্দিকে নিঃশব্দ নিঝুম।

তখন বাক্যের অর্থাশ্রয়ী ব্যঞ্জনা কি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে ? মূল কবিতাটিতে জনহীন দুপুরবেলাকে বলা হয়েছে রোদ-মাখানো রাত্রি। পরিবর্তিত কবিতাটিতেও তাই বলা হয়েছে ; খালি 'রাতি'র বদলে বলা হয়েছে 'নিশা', 'ঝাঁ ঝাঁ'-কে করা হয়েছে 'খাঁ খাঁ', চারিদিকে—চতুর্দিকে, 'নিস্তব্ধ' করলাম 'নিঃশব্দ'। তাতে কিন্তু অর্থ বদলালো না ; অর্থ-আশ্রয়ী ব্যঞ্জনা ও নষ্ট হল না।।

এই জিনিষটাই অর্থালঙ্কারের বিশেষত্ব। শব্দালঙ্কার একমাত্র শব্দের ধ্বনির ওপরেই নির্ভরশীল। শব্দের ধ্বনি বদলিয়ে দিলেই শব্দালঙ্কারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, এমন কি লুপ্তও হয়ে যায়।

—নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে

তিল ঠাঁই আর নাহিরে—

এই বাক্যটির সৌন্দর্য বা অলঙ্কার 'ন' ধ্বনিটাকে বারবার ব্যবহার করার ওপর নির্ভর করছে। সেইজন্য কবিগুরু এমন সব শব্দ ব্যবহাব করেছেন যাতে 'ন' আছে। ঐ লাইনটিকে যদি এইভাবে বলি—

—সুনীল মেঘে আষাঢ় আকাশ

গিয়েছে দেখ ঢেকে

কোথাও নাই ঠাঁই --

তখন, অর্থ ঠিক থাকলেও বাক্যটির ধ্বনিসৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল। শব্দালঙ্কারের শব্দের'ধ্বনি পরিবর্তন সহ্য করার শক্তি নাই। কিন্তু অর্থালঙ্কার শব্দের ধ্বনির দিকে তাকিয়ে সৃষ্ট হয় না বলে শব্দের ধ্বনি পরির্তন সে সহ্য করতে পারে।

শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের এইটাই প্রধান পার্থক্য ॥

দেহের অলঙ্কারের একটা সীমা আছে, কিন্তু :নের গুণের সংখ্যা অনেক। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যত অলঙ্কার একজন রমণী গ্রহণ করতে পারেন—তার সংখ্যা নির্দিষ্ট এবং মনের গুণের তুলনায় কম। তেমনি শব্দালঙ্কারের সংখ্যা বেশি নয়—অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি—মোটামুটি এই কটি। কিন্তু অর্থালঙ্কারের সংখ্যা এত কম নয়। তাদের সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা করে আমরা সেগুলিকে আমাদের সুবিধার জন্যে মোটামুটি পাঁচটা ভাগে ভাগ করে নিই। কিন্তু এই পাঁচটি ভাগেরও আবার অনেকগুলি করে শাখা আছে।

এই মূল পাঁচটি ভাগ হচ্ছে—সাদৃশ্যমূলক, বিরোধমূলক, শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক এবং গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার। প্রথমে আময়া সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করব ॥

### ।। সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার ।।

গ্রীষ্মকালের বিকেলের দিকে পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সেই ভয়ালদর্শন মেঘে আবৃত হয়ে যাচ্ছে, কবি নির্জন মাঠের ধারে বসে থাকার সময় সেই মেঘ দেখলেন। মনে হল, যেন রুদ্রদেব তাঁর মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে ঘোর ধ্বংসের আয়োজনে প্রস্তুত হচ্ছেন।

কবি এখানে মেঘকে তুলনা করলেন রুদ্রদেবের জটার সঙ্গে। কারণ, মেঘের বিস্তার, মেঘের রঙ ইত্যাদির সঙ্গে সন্ন্যাসীর জটার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মেঘ আর জটা ত এক জিনিষ নয়—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কবির কল্পনাদৃষ্টি এই দুটো বিসদৃশ জিনিষের মধ্যে একটা সাধারণ মিল দেখতে পেয়েছেন—সে মিলটি শুধু বাইরে নাই, আছে গুণে বা property-তেও। এই অন্তর্নিহিত গুণের দিকে তাকিয়ে দুটো বিজাতীয় বিসদৃশ বস্তুর সাহায্যে যে সাদৃশ্যবোধক অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকেই বলে সা দৃ শ্য মূ ল ক অর্থালঙ্কার ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে একই ধরণের দুটো জিনিষের মধ্যে সাদৃশ্য টানা অর্থালঙ্কারে চলছে না। 'ঠিক রমার মুখের মত বীণার মুখ বা 'শৈলেন মান্নার ফ্রী-কিকের মত হীরেনের ফ্রী-কিক' বললে আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারছে না। কারণ, যাকে তুলনা দেওয়া হচ্ছে এবং যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হচ্ছে—দুটো একই ধরণের জিনিষ। কিন্তু যদি বলি, রমার মুখ' যেন পূর্ণিমার চাঁদ, বুলেটের মত হীরেনের ফ্রী-কিক,—তখন রমার মুখের আকৃতি চাঁদের মত গোল কিনা, তাতে চাঁদের গায়ের পাহাড়-পর্বতের মত প্রাকৃতিক ব্যাপার কিছু আছে কিনা, কিংবা হীরেন যখন ফুটবলে ফ্রী-কিক করে তখন সেটা সত্যিই বুলেটের মত সেকেণ্ডে ২৪০০ ফুট বেগে ছোটে কিনা যন্ত্রপাতি সাজিয়ে আমরা তা মাপতে বসি না। কথা দুটি শুনলে আমরা নির্বিবাদে মেনে নিই, পূর্ণিমার চাঁদের যে সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা, রমার মুখে সেই সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা আছে ; বুলেট যেমন তীব্রবেগে যায় এবং তার যেমন ক্ষতি করবার প্রচণ্ড শক্তি আছে, হীরেনের ফুটবলের ফ্রী-কিক ঠিক তেমনি। চাঁদ এবং মুখ, বুলেট এবং ফুটবল বিজাতীয় বিসদৃশ জিনিষ বলেই এখানে তুলনাটা খেটেছে ভাল॥

অনেকগুলি শাখা নিয়ে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের বিভাগটি সমৃদ্ধ। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, প্রতীপ, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা স্মরণ, সামান্য, অর্থশ্লেষ, সহোক্তি ইত্যাদি অর্থালঙ্কার এই বিভাগের অন্তর্গত॥

**উপমা ঃ** রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়িকার নাম কুমুদিনী। এই কুমুদিনীর রূপগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছেন, কুমু যেন রজনীগন্ধার ডাঁটি। রজনীগন্ধার ডাঁটি যেমন শুভ্র-সুন্দর, নম্র ও মধুর, কুমুর রূপ এবং স্বভাবে সেই স্নিগ্ধ নম্রতা, পেলব মাধুর্য, অপরূপ শান্তি। এখানে তুলনাটি নির্ভর করছে সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট দুটো বিজাতীয় পদার্থের গুণগত সাদৃশ্যের ভিত্তির ওপর। এই ধরণের সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারকে বলে উ প মা॥

তুলনা দেবার সময় আমরা চারটি জিনিষ বিবেচনা করি—যাকে তুলনা করছি, যার সঙ্গে তুলনা করছি, যে-শব্দ দিয়ে তুলনা করছি এবং যে-গুণের মিল দেখে তুলনা করছি।

উপরের উদাহরণে তুলনা করছি কুমুদিনীকে—এর আলঙ্কারিক নাম উ প মে য় ॥

কার সঙ্গে তুলনা করছি? না, রজনীগন্ধা ফুলের সঙ্গে। একে বলা হবে উ প মা ন।

কোন গুণের কথা বিবেচনা করে তুলনা করছি?

—ফুলের পেলবতা, নম্রতা, শান্ত সৌন্দর্যের কোমল আবেদনটি কুমুর মধ্যেও আছে বলে। এই গুণগুলি ফুলের এবং কুমুদিনীর স্বভাবের সা ধা র ণ ধর্ম।

আর, সমস্ত তুলনা কাজটি সাধিত হচ্ছে 'মত' এই সা দৃ শ্য বা চ ক শব্দের সাহায্যে।

উপমেয়, উপমান, সাধারণধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ—এই চারটি অঙ্গই যখন একত্র কাজ করবে তখনই 'উপমা' অর্থালঙ্কারটিকে আমরা বলব পূ র্ণো প মা ॥

জীবনানন্দ দাসের কবিতায় আছে—

রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল।

তুলনা দেওয়া হচ্ছে রোদের নরম রঙকে। এটি উপমেয়। শিশুর গালের লালিমা—উপমান। রোদের লালিমা এবং শিশুর গালের লালিমা সাধারণধর্ম। সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মত।

এটি পূর্ণোপমার উদাহরণ ॥

সাদৃশ্য দুরকমের হতে পারে—গুণগত এবং ক্রিয়াগত। 'ফুলের মত নরম' গুণগত সাদৃশ্য আর 'ফুলের মত ফুটে উঠছে'—ক্রিয়াগত সাদৃশ্য, কারণ যে ফুটে উঠছে তার ফুটে-ওঠা কাজটি ফুল-ফোটার মত।

সাদৃশ্যবাচক শব্দও অনেক আছে—মত, সম, যথা পারা, যেমতি, যেন, প্রায়, কল্প, সদৃশ, তুল্য, ন্যায়, বৎ ইত্যাদি। কবিতায় এগুলি ব্যবহারের কয়েকটি নমুনা দেখাই:

শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। —রবীন্দ্রনাথ।

বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী —ভারতচন্দ্র।

বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি'
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে ! —মধুসূদন ।

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা । —রবীন্দ্রনাথ ।

এই অন্ধকার যেন উত্তাল বিশাল এক সমুদ্রের গাঢ় বিষণ্ণতা । – চিত্ত ঘোষ ।

নদীর জল মচ্‌কাফুলের পাপড়ীর মত লাল ॥ —জীবনানন্দ দাশ ।

আধবোজা চোখ
শেষ হয়ে আসা মোমের মত ফ্যাকাসে আলোক
বিকীর্ণ করে । —বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা । —রবীন্দ্রনাথ ।

সদৃশ, বৎ ইত্যাদির গদ্যে ব্যবহার বেশি । কবিতায় কম ।

এই সমস্ত উদাহরণগুলি পূর্ণোপমা-রও উদাহরণ ॥

জীবনানন্দ দাশের একটি বিখ্যাত কবিতার থেকে একটি স্তবক উদ্ধার করি—

'কোনদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে

এই স্তবকটির শেষ পঙক্তিটিতে একটি উপমা আছে। সেখানে উপমেয় নিস্তব্ধতা, উপমান উটের গ্রীবা, সাদৃশবাচক শব্দ 'মতো'—কিন্তু সাধারণধর্ম ? সাধারণধর্ম অনুপস্থিত। কবি পাঠকের ওপর তা খুঁজে নেবার, বুঝে নেবার ভার দিয়েছেন।

রসিক পাঠক বুঝতেই পারছেন এখানে কবির বক্তব্য, উটের গ্রীবা যেমন কুৎসিৎ সেই নিস্তব্ধতাও তেমনি কুৎসিৎ। কদর্যতা এখানে সাধারণধর্ম। কিন্তু সেটা উল্লেখ না-করলেও উপমাটি ব্যর্থ হচ্ছে না।

এবার আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। এই পঙক্তিটি কবি চিত্ত ঘোষের একটি চমৎকার কবিতা থেকে নেওয়া—

স্মৃতি কোনো অবলুপ্ত স্থাপত্যের জলমগ্ন সিঁড়ি।

এখানে উপমেয় -স্মৃতি, উপমান অবলুপ্ত স্থাপত্যের জলমগ্ন সিঁড়ি, সাধারণধর্ম অবলুপ্তি। কিন্তু সাদৃশ্যবাচক যেন, ন্যায় ইত্যাদি কোন শব্দ এখানে নাই। তবুও উপমাটি সার্থক।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' কবিতায় একটি উপমা—

মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও অঙ্গে

এখানে উপমেয় মেঘ, উপমান জুঁইফুল। সাধারণধর্ম জুঁইফুলের ও বৃষ্টির শুভ্র সৌন্দর্য। সাদৃশ্যবাচক কোন শব্দ এখানে কবি ব্যবহার করেননি। তা সত্ত্বেও তা আমাদের কল্পনাকে পীড়িত করছে না।

চণ্ডীদাস রাধিকার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী

দেখিনু আঙিনা মাঝে

এখানে উপমেয় রাধা এবং কেবল সেই তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নারই উল্লেখ আছে। রাধার উপমান কথাটি ভাঙলে পাব। কেমন রাধা? যিনি তড়িতের মত বর্ণবিশিষ্টা, নয়ন যাঁর হরিণের মত। সাধারণধর্ম?—তা-ও উল্লেখ নাই। সাদৃশ্য-বাচক শব্দও নাই। শুধু উপমেয় উল্লেখ করে এমন আশ্চর্য উপমাসৃষ্টি খুব কম কবিই করতে পেরেছেন

জীবনানন্দ, চিত্ত ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চণ্ডীদাস ইত্যাদি কবির যে উদাহরণগুলি উপরে দিলাম তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উপমা অলঙ্কার ঠিক ব্যবহার হয়েছে কিন্তু উপমার চারটি অঙ্গের সব কটির সাহায্য নেওয়া হয়নি। তবে সবকটি উদাহরণে উপমেয়, বা যাকে তুলনা দেওয়া হচ্ছে তাকে, কবিরা গুপ্ত রাখেননি॥

যে উপমাতে একমাত্র উপমেয়টিকে বজায় রেখে উপমান, সাধারণধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের যে-কোন একটি, দুটি এমন কি তিনটি অঙ্গেরই যদি উল্লেখ না করা হয়, তবে তাকে বলা হবে লু প্তো প মা ॥

কবিরা অনেক সময় যাকে তুলনা দিচ্ছেন তার উপমান একটি রেখেই তৃপ্ত হন না। অনেকগুলি উপমানের ব্যবহার করে উপমেয়টিকে স্পষ্ট করে তুলতে চান।

উপমেয় একটি, কিন্তু উপমান অনেক—এই ধরণের উপমাকে বলা হয় মা লো প মা ॥

কবি বিষ্ণু দে'র কবিতা থেকে একটি উদাহরণ দিই।

> আর ছোটে দঙ্গলে দঙ্গলে অন্ধ ও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা
> অসহায় গোপিনীর মত ছোটে পাণ্ডুর মেঘেরা
> যেন কোনো লঙরের খাওয়ার সন্ধানে
> কলকাতার পথে পথে অনাহারী ভিড়ে
> ভিখারী স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
> কিম্বা কোনো কাঁদুনে-বোমায় ডালহাউসির ফেরারী জনতা।

এখানে উপমেয় পাণ্ডুবর্ণ মেঘ। তার আকাশে ভেসে যাওয়া কি রকম ?—যেন অসহায় গোপিনীর মৃত্যুভয়ে পালানোর মত; কলকাতার পথে না খেয়ে মরবার ভয়ে স্বামীর পিছনে-ছোটা পতিব্রতা গ্রাম্যবধূর চলার মত; কাঁদুনে বোমা ফাটানোর পরে ডালহাউসির অফিস-ফেরতা লোক যেমন প্রাণভয়ে পালায় সেই পালানোর মত। মেঘের ভেসে-যাওয়াকে এখানে তিনটি উপমানের সাহায্যে কবি স্পষ্ট করেছেন। উপমা তিনটির বাস্তবধর্মীতাও লক্ষ্যণীয়।

অন্যান্য উদাহরণ ঃ

> মলিন বদনা দেবী, হায় রে যেমতি,
> খনির তিমির গর্ভে ( না পারে পশিতে
> সৌরকর রাশি যথা ) সূর্যকান্ত মণি
> কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে। —মধুসূদন।

যত তাপস বালক—

শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,

ভক্তি-অশ্রুধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা —রবীন্দ্রনাথ

একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে ঃ

পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মত ;

কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে

যে মুক্তা আমার নীল-মদের গেলাসে রেখেছিল

হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে—তেম্নি—

তেম্নি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও। জীবনানন্দ দাশ।

আলোক যখন স্পর্শ দিল আল্‌তো হাতে,

অন্ধকার যে উঠল কেঁপে

বিকেল বেলার নদীর মত,

হাওয়ার চুমোয় শিউরে ওঠা সোনার ধানের শিষের মত,

নীহারিকার জ্যোতির মত মায়ায়-ঘেরা ভোর বেলাতে ! অ. ম.।

**রূপক ঃ** কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকে একটি শ্লোক শোনাই—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জ্বালায়তে

তাপোহপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।

সাপি তদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং

কন্দর্পোহপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥

—হে কৃষ্ণ, গৃহ এখন সখীর ( রাধার ) কাছে অরণ্যের মত মনে হচ্ছে। তিনি তাঁর প্রিয়সখীদেরও বন্ধন রজ্জুর মত মনে করছেন। অবিরল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বিনির্গত হওয়াতে তাঁর দেহতাপ যেন দাবাগ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে। আমাদের সখী এখন পাশবদ্ধা হরিণীর মত। হায়, নিষ্ঠুর মদন যেন লীলাচ্ছলে কৃতান্তরূপী ব্যাঘ্রের মত তার প্রাণসংহারের জন্য উদ্যত ॥

এই শ্লোকটিতে অনেকগুলি উপমা কবি ব্যবহার করেছেন—গৃহ অরণ্যের মত, প্রিয়সখীরা বন্ধনরজ্জুর মত, রাধার দেহতাপ দাবাগ্নিশিখার মত, রাধা পাশবদ্ধা হরিণীর

মত, কন্দর্প যমের মত, বাঘ যেমন হরিণের প্রাণ নাশ করে তেমনি কন্দর্প প্রেমের জ্বালায় আকুল রাধিকার প্রাণ সংহার করতে উদ্যত। কিন্তু যত উপমাই কবি ব্যবহার করুন না কেন—উপমেয় অর্থাৎ গৃহ, প্রিয়সখী, দেহতাপ, কন্দর্প এবং রাধিকাই এখানে প্রধান। তুলনাগুলি কোন সময়েই উপমেয়কে গ্রাস করছে না, আচ্ছন্ন করছে না।

একজন আধুনিক কবির কবিতা থেকে এবার দুটি পঙক্তি শোনাই—

তার চোখে অশ্রু। আমি কান্নাতেও জেনেছি সঠিক,
কত দুঃখ-শুক্তি থেকে জন্ম নেয় আনন্দ-মৌক্তিক॥

প্রিয়তমার চক্ষু হতাশার অশ্রুতে ভারাক্রান্ত। প্রেমিকেরও চোখে জল কিন্তু সেই যন্ত্রণা নিষ্ফল নয়। শুক্তির চোখের জল যেমন মুক্তায় জমাট বাঁধে এবং সেই মুক্তা হয় আনন্দের বিলাসের লীলার সামগ্রী—তেমনি প্রেমিক জানে তার দুই চোখের শুক্তির আধারে যে যন্ত্রণার অশ্রু, একদিন সেই যন্ত্রণার মধ্যে থেকেই একটি অপরূপ আনন্দ জেগে উঠবে; সেই আনন্দ-মুক্তার আশাতেই সে আজকের চোখের জল স্বীকার করে নিয়েছে॥

কবি এখানে দুটি তুলনা ব্যবহার করেছেন—দুঃখকে তুলনা করেছেন শুক্তির সঙ্গে আর আনন্দকে মুক্তার সঙ্গে। দুঃখ-শুক্তি আর আনন্দ-মৌক্তিক কথা দুটি ভাঙলে পাই দুঃখ রূপ শুক্তি এবং আনন্দ রূপ মুক্তা।

উপমেয় প্রথমটিতে দুঃখ এবং দ্বিতীয়টিতে আনন্দ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে দুঃখ এবং আনন্দের চাইতে শুক্তি এবং মুক্তাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, অর্থাৎ উপমেয়কে আচ্ছন্ন করছে। এখানে উপমান এবং উপমেয়—দুটিই বিজাতীয় কিন্তু উপমানটি উপমেয়কে আপনার রূপে রূপায়িত করে তুলেছে, আর এই রূপায়নের ফলেই দুটো বিজাতীয় জিনিষকে এক বলে মনে হচ্ছে। একেই বলে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা।

রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ

উপমেয় উপমানের যে অভেদ তারই নাম রূ প ক। বাক্যে রূপককে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করলে সেটাকেই বলব রূ প কা ল ঙ্কা র।

মৃত্যুসাগর পেরিয়ে এলাম জীবন-মহাপ্রান্তরে
হতাশ হৃদয় নতুন আশায় মুক্তপ্রাণের গান ধরে॥

এখানে মৃত্যুসাগর, জীবন-মহাপ্রান্তর রূপক। রূপকে ক্রিয়াপদটি উপমানের অনুগামী।

আঁখিপাখী ধায় দিকসীমানার পানে

সেখানে সে নাই—সে কি জানে, সে কি জানে ?

এখানে 'আঁখিপাখী' রূপকের উপমান পাখী। ক্রিয়াপদ ধায় পাখীর অনুগামী। আঁখি ধায় না, পাখীই ধায়। ব্যঞ্জনাটি আঁখির, কিন্তু ক্রিয়াপদটি পাখীর বাধ্য॥

রূপকের তিনটি শাখা : নিরঙ্গ, সাঙ্গ, পরম্পরিত॥

একটি উপমেয়ের সঙ্গে একটার বেশি উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে আমরা বলব নি র ঙ্গ রূ প ক।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিই—

অন্তর-মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে
একটি চন্দ্র অসীমচিত্তগগনে
চারিদিকে চির যামিনী॥

এখানে বিচিত্ররূপিনীর উপমান অনেকগুলি—সে যেন মুগ্ধ সজলনয়নের স্বপ্ন, হৃদয়বৃন্তে-ফোটা পদ্ম, চিত্তগগনের চাঁদ। কিন্তু সবগুলিই একই উপমেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সেই স্বপ্ন কেমন, পদ্ম কেমন, চাঁদ কেমন সেটা বলবার জন্যে স্বপ্ন, পদ্ম এবং চাঁদের নতুন রূপক কবি সৃষ্টি করেননি। তাই একে নিরঙ্গরূপক বলতে বাধা নাই॥

'শোক-ঝঞ্ঝা' কথাটি রূপক। এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের তুলনা হয়েছে। কিন্তু শোক কথাটির সঙ্গে কারা কেমনভাবে শোক করছে, এই ধারণাটা থাকা প্রয়োজন। শোকের একটা আধার এবং প্রকাশভঙ্গী থাকা দরকার। ধরা যাক, স্বামী মরে গেলে বিধবা স্ত্রী হাহাকার করে শোক করছেন। এখানে বিধবা স্ত্রী শোকের আধার এবং হাহাকার শোকের ভঙ্গী। এরা শোকের অঙ্গ। আবার ঝড়ের অঙ্গ মেঘ, মেঘের গর্জন, প্রবল বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদি॥

যে রূপকে উপমেয়ের একাধিক অঙ্গ থাকবে, এবং উপমানেরও একাধিক অঙ্গ নিয়ে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হবে—সেখানে হবে সা ঙ্গ রূ প ক। অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ—তবে হবে সাঙ্গরূপক, এই নির্দেশ আছে সাহিত্যদর্পণে ॥

এই শোক এবং ঝড় নিয়েই সৃষ্ট রূপকের বহু ব্যবহৃত একটি উদাহরণ দিই মধুসূদনের কবিতা থেকে—

শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রু বারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !

এখানে শোক করছেন রক্ষপুরীর রমণীবৃন্দ। রমণীকুল শোকের আধার। মুক্তকেশ, ঘন ঘন নিশ্বাস, চোখের জল এবং হাহাকার রব এগুলি রমণীর শোকের প্রকাশ-চিহ্ন তেমনি আবার ঝড়ের প্রকাশচিহ্ন এবং আধার বিদ্যুৎ ( সুরসুন্দরী ), মেঘ, প্রবল বাতাস, বৃষ্টি এবং মেঘ-গর্জন। কবি উপমেয় শোকের অঙ্গ রেখেছেন পাঁচটি—রমণীকুল, মুক্তকেশ, ঘন ঘন নিশ্বাস, চোখের জল, হাহাকার ; আবার উপমান ঝড়েরও অঙ্গ রেখেছেন পাঁচটি—বিদ্যুৎ, মেঘ, প্রবল বাতাস, বৃষ্টি এবং মেঘগর্জন। এই পাঁচটিই আবার উপমেয়ের পাঁচটি অঙ্গের সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধে আবদ্ধ। রমণীরা বিদ্যুতের মত, রমণীর মুক্তকেশ ঝড়ের দিগন্তবিস্তৃত মেঘের মত, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবল বায়ুর মত, চোখের জল বৃষ্টির মত, হাহাকার মেঘমন্দ্রের মত। উপমেয়ের পাঁচটি অঙ্গ উপমানের পাঁচটি অঙ্গের সঙ্গে চমৎকার মিলেছে। তাই এটি সাঙ্গরূপকের সার্থক উদাহরণ ॥

অন্যান্য উদাহরণ :

দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কালামাণিকের মালা গাঁথি নিজগলে।
কানুগুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু-অনুরাগ রাঙা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥ —চণ্ডীদাস।

আকাশের সর্বরস রৌদ্র রসনায়

লেহন করিল সূর্য ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

সবশেষে পরম্পরিত রূপক সম্পর্কে আলোচনা করে রূপক প্রসঙ্গে ইতি টানা হবে। কবি বুদ্ধদেব বসুর লেখা দুটি পঙক্তি ধরা যাক—

চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,

অচেতন নেপথ্যের অভিনয় কর প্রয়োজন।

এখানে চেতনার রূপক নটমঞ্চ, নিদ্রার রূপক যবনিকা এবং নেপথ্যের উপমেয় অচেতন। নটমঞ্চের থাকে যবনিকা, তেমনি চেতনের আবরণ নিদ্রা। রঙ্গমঞ্চের পিছনে থাকে নেপথ্য, যেমনি চেতনের নেপথ্যে অচেতন।

এখানে একটি উপমেয় চেতনার, উপমান রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক যবনিকা এবং নেপথ্যের—সেই প্রয়োজনে আরেকটি রূপক সৃষ্টি হচ্ছে নিদ্রা এবং যবনিকার, অচেতন এবং নেপথ্যের। এখানে সবকটি রূপকে কার্যকারণভাবের পরম্পরা অব্যাহত আছে। এই রকম, যে-রূপকে একটা উপমেয়ের সঙ্গে একটা উপমানের অভেদকল্পনা, অন্য উপমেয়ের সঙ্গে অন্য উপমানের অভেদকল্পনা পরম্পরিতভাবে আসে সেখানে হয় প র ম্প রি ত রূ প ক ॥

একেবারে আধুনিক একটি কবিতা থেকে এর একটা চমৎকার উদাহরণ দিই—

তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছ ভবিষ্যৎ

আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।—সুকান্ত ভট্টাচার্য ॥

**উৎপ্রেক্ষা ঃ** খুব নিকট সাদৃশ্য থাকলে অনেক সময় যাকে তুলনা দেওয়া হচ্ছে তাকে, যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে সেই জিনিষ বলে সন্দেহ হয়। রবীন্দ্রনাথের—

সন্ধ্যা রাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা

আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা

বাঁকা তলোয়ার ;

এখানে ঝিলমের স্রোতকে তলোয়ারের সঙ্গে এবং অন্ধকারকে তলোয়ারের খাপের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। ঝিলমের বাঁকা স্রোতে অন্ধকার নেমে এল। কি রকম ? না—যেন বাঁকা তলোয়ারকে খাপে বন্ধ করা হল। ঝিলম হারাল তার উজ্জ্বলতা, যেমন খাপে বন্দী উজ্জ্বল তলোয়ার হারায় তার দ্যুতি ॥

এই কথাটি শুনবার সময় আমাদের মনে ঝিলম নদীর বুকে অন্ধকার নেমে আসার ভাবটির চেয়ে খাপে-বন্ধ তলোয়ারের দৃশ্যটিই বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। কল্পনায় ঝিলমের বুকের জমাট অন্ধকার দেখছিনা, খাপে-বন্দী তলোয়ারটিই প্রধান হয়ে ভেসে উঠছে। অর্থাৎ উপমেয়কে উপমান বলে মনে হচ্ছে॥

এই রকম মনে হওয়ার কারণ—ঝিলমের বাঁকা গড়নের সঙ্গে তলোয়ারের বাঁকা গড়নের, ঝিলমের রৌদ্রদীপ্ত উজ্জ্বলতার সঙ্গে শানিত তলোয়ারের দীপ্তির এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে তলোয়ারের খাপের খুব সাদৃশ্য আছে॥

এই নিকটসাদৃশ্য হেতু উপমানকে উপমেয় বলে মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে যে অলঙ্কার, তাকে বলে উ ৎ প্রে ক্ষা॥

অন্যান্য উদাহরণ :

পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘপথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।

—রবীন্দ্রনাথ।

অগ্নিকণা জ্বেলে দুই চোখে
স্তব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন রুদ্রবীণা তারে তারে
মোচড়ে মোচড়ে বাঁধা। —বিষ্ণু দে।

আমি জানি, কিছুই থাকে না,
পলকে শুকায়ে যায়—সবই যেন সাবানের ফেনা!

—বুদ্ধদেব বসু।

কাকগুলি মিশে আছে রজনীর প্রগাঢ় আঁধারে,
বিহ্বল শিশুরা যেন জননীর স্তনের ভাণ্ডারে॥ —অ. ম.।

উৎপ্রেক্ষার দুটি ভাগ : বাচ্য-উৎপ্রেক্ষা আর প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা॥

বাচ্য-উৎপ্রেক্ষার সন্দেহ বোঝায় এমন শব্দটির উল্লেখ থাকে। ঝিলমের স্রোতে অন্ধকার নেমে এল কেমন? যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার। খাঁ খাঁ নিঝুম দুপুর কেমন?—যেন রোদ-মাখানো রাত। এই উৎপ্রেক্ষা দুটিতে কবি অন্ধকারে

আবৃত ঝিলমের স্রোতকে দেখে সন্দেহ করছেন তলোয়ার যেন খাপবন্দী হল, নিঝুম দুপুরকে দেখে সন্দেহ হচ্ছে যেন রোদ-মাখানো নিঝুম রাত। এই সন্দেহ দুটি স্পষ্ট হয়েছে 'যেন' শব্দটির ব্যবহারে। যেন, বুঝি, মনে হয়, মনে গণি—এই শব্দগুলি দিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। তাহলে বাচ্য-উৎপ্রেক্ষা চিনবার সহজ উপায়, তার মধ্যে সন্দেহবাচক শব্দ থাকবে॥

মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা। —রবীন্দ্রনাথ।

অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে। —রবীন্দ্রনাথ।

যখন ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ করি
আমাদের শুকনো গলা শোনায়
চাপা অর্থহীন
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
—টি, এস, এলিয়ট ঃ বিষ্ণু দে-র অনুবাদ।

আকাশ-পারে পূবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে। —রবীন্দ্রনাথ।

শৈলর মা ঝিমায় আর গুন্‌গুনানি সুরে বিনায়, শুনলে মনে হয় ঘরে বুঝি ভ্রমর আসছে।

—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র তী য় মা ন - উ ৎ প্রে ক্ষা য় সন্দেহসূচক শব্দ (যেমন, যেন, বুঝি, মনে হয় ইত্যাদি) থাকে না, কিন্তু না থাকলেও সন্দেহের ভাবটি বেশ বোঝা যায়।

শিখগুরু যমুনাতীরে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছেন, শিষ্য রঘুনাথ এক জোড়া সোনার বালা তাঁর পায়ের কাছে উপহার হিসাবে রাখলেন। গুরু একবার দেখে আবার শাস্ত্র পড়তে লাগলেন। অসাবধানে একটি বালা গড়িয়ে যমুনার জলে পড়ে গেল। তখন—

"আহা আহা" চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।
আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

প্রাণ-মন-কায়ের আগ্রহ যেন একখানা বাহু হয়ে জলে ঝাঁপ দিল। এখানে শেষ দুটি পঙক্তিতে ব্যবহৃত উৎপ্রেক্ষায় কোথাও সন্দেহবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু সন্দেহের ভাবটি বেশ বোঝা যাচ্ছে।

অন্যান্য উদাহরণ ঃ

ওই দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের ওপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।

—রবীন্দ্রনাথ ( মুক্তধারা )।

মোগল শিখের রণে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ জুঝে ভুজঙ্গ সনে। —রবীন্দ্রনাথ।

**সন্দেহ ঃ** কবি যদি উপমান এবং উপমেয় দুটিতেই সমান সন্দেহ প্রকাশ করেন তবে হয় স ন্দে হ অলঙ্কার॥

নীল আকাশে শাদা মেঘের টুকরো ভেসে চলেছে, তাই দেখে কবির মনে হল—

ও কি শাদা মেঘ, নাকি শাদা পাখী
নীলাকাশে উড়ে চলে—
নাকি অপ্সররমণীর শ্বেতবসন ভাসিয়া যায়
আকাশগঙ্গাজলে।

এখানে আকাশের বুকে ভেসে-যাওয়া শাদা মেঘকে দেখে কবির একবার মনে হচ্ছে শাদা পাখী, একবার অপ্সরীর শ্বেতবসন বলে। এই সংশয়ই সন্দেহ অলঙ্কারের প্রাণ। আরো উদাহরণ ঃ

ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
'চেয়ে দেখ রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?' —মধুসূদন।

প্রমীলাকে বীরবেশে সজ্জিতা দেখে নিশীথে উষা বলে লক্ষ্মণের সংশয় হচ্ছে।

মাঝে মাঝে যেন চেনা-চেনা মত মনে হয় থেকে থেকে—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হ'ল মেঘ, মনে হ'ল পাখী, মনে হ'ল কিশলয়,
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই, মনে হ'ল কিছু নয়।
দুই ধারে একি প্রাসাদের সারি, অথবা তরুর মূল,
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারই মনের ভুল। —রবীন্দ্রনাথ।

বহুদীর্ঘপ্রতীক্ষায় প্রাণ যবে হ'ল ওষ্ঠাগত
সহসা সম্মুখে আসি সে দাঁড়ালো উর্বশীর মত।
চকিত নয়নে চাহি মনে হয়, চন্দ্র দিবাকালে,
অথবা কি স্বপ্নে আছি, কিংবা বদ্ধ মতিভ্রম-জালে।
—শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

সে কি সুখ, সে কি ব্যথা, সে কি এক যন্ত্রণার অনির্বাণ শিখা ?
না কি প্রেম শুধু মরীচিকা ! —হুমায়ূন কবীর।

তোমার চোখ—সে যেন এক চপল মধুকর
ফুলের বুকে হানিছে প্রেমশর—
অথবা সে কি মেঘের বুকে চকিত বিদ্যুৎ
ঝলসি উঠে, আশায় হাসে হৃদয়-দিগন্তর !

**অপহ্নুতি ঃ** যাকে তুলনা করা হচ্ছে তাকে অস্বীকার করে, যদি যার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হচ্ছে, তাকে প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে হয় **অ প হ্নু তি** অলঙ্কার। উপমেয় এখানে গৌণ, প্রধান প্রতিষ্ঠা উপমানের ॥

অপহ্নুতিতে উপমেয়কে অস্বীকার করা হয়—না, নয়, নহে, ব্যাজ, ছল, ছলনা ইত্যাদির দ্বারা।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের—

চোখে চোখে কথা নয় গো বন্ধু
আগুনে আগুনে কথা।

বাক্যটিতে চোখ উপমেয়, উপমান আগুন। কিন্তু উপমেয় চোখকে অস্বীকার করে উপমান আগুন এখানে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। সেইজন্যই একে বলা হবে অপহ্নুতি।

ও যেন বৃষ্টি নয়,
কোনো বিরহিণী দিগ্বধূর অশান্ত ক্রন্দন। —রবীন্দ্রনাথ।

ও ত আলো নয়, ও যে অমরার দীপ্ত আশীর্বাদ,
ঝরিতেছে নির্বাধ। —কুমুদরঞ্জন।

ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাসিছে জ্যোছনাছলে!
—শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

তারাই আজি নিঃস্ব দেশে, কাঁদছে হ'য়ে অন্নহারা ;
দেশে যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা। —নজরুল ইস্‌লাম।

শিকড়ে ঝুড়িতে ছাওয়া বিরাট বটগাছটির নিচে বসে বসে মনে
হল, এত গাছ নয়, যেন খোদাতালার হাতে-গড়া বিশাল
ইমারত। —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

**নিশ্চয় ঃ** অপহ্নুতিতে উপমেয়কে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা করা হয় উপমানকে। আর ঠিক এর উল্‌টোটি যদি করা হয়, অর্থাৎ উপমানকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা করা হয় উপমেয়কে—তবে হবে **নি শ্চ য়** অলঙ্কার ॥

বিহারীলালের—

অসীম নীরদ নয়,
ঐ গিরি হিমালয়

এই বাক্যটিতে হিমালয় উপমেয়, উপমান অসীম নীরদ (মেঘ)। হিমালয়কে দেখে সীমাহীন মেঘের স্তূপ মনে হচ্ছে ; কবি পাঠকের ভুল ভেঙে দিচ্ছেন, ওটা মেঘ নয় (উপমানকে অস্বীকার), আসলে ওটি হিমালয় (উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা)॥

অন্যান্য উদাহরণ ঃ

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত
ফেন-হিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে। —রবীন্দ্রনাথ।

পুষ্পধনু, কেন দহো এ অঙ্গ আমার,
ব্রজের রমণী আমি, নহি শিব শঙ্কর উমার।
এ নহে জটার ভার, এ ত বেণী মস্তক উপরে,
জড়ানো মালতীমালা, নহে বহে গঙ্গা কলস্বরে।
সীমন্তে মৌক্তিক সিঁথি, নয় সেত স্নিগ্ধ শশধর—
তৃতীয় নয়ন নহে, ললাটে ও সিন্দুর সুন্দর।
কণ্ঠে ত গরল নহে, দেখো, ও যে মৃগমদসার,
উরসে ভুজঙ্গ নহে, শোভা পায় দীপ্ত মণিহার।
ওগো পুষ্পধনু, তুমি দেখ মেলি' তোমার নয়ন—
অঙ্গে মোর ভস্ম নহে, এ যে হায় শীতল চন্দন !

—বিদ্যাপতির অনুসরণে।

নয় এতো অগ্নিদীপ্ত শঙ্করের তৃতীয় নয়ন—
এতো দীপ্ত খর সূর্য,
দগ্ধ করে বসন্তের আনন্দের সব আয়োজন। —মাধবী দেবী।

আকাশ জুড়ে উঠলো বেজে মধুর সুরতরঙ্গ
সে নয় সুরপুরীর বীণা—তোমার হাসির বিভঙ্গ —অ. ম.।

সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি ও নিশ্চয় অলঙ্কারের যে আলোচনা উপরে করা হল তাতে সতর্ক পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন এই চারিটির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি এবার দেখিয়ে দিই।

মনে করা যাক, একজন কবি আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘকে রমণীর এলায়িত চুলের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন। যদি তাঁর মেঘ দেখে মনে হয় 'একি মেঘ, না চুল ?', সেখানে উপমেয় এবং উপমান দুটিতেই সমান সংশয় আরোপিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে হবে স ন্দে হ অলঙ্কার ॥

যদি মনে হয় 'এই মেঘটি যেমন রমণীর চুল', তাহলে বুঝতে হবে সংশয় উপমানে। সেখানে অলঙ্কারটি হবে উ ৎ প্রে ক্ষা ॥

আবার তাঁর মনে হতে পারে 'এটা মেঘ নয়, চুল' সেখানে উপমেয় 'মেঘ'-এর চাইতে উপমান 'চুল' বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এখানে হবে অ প হ্নু তি ॥

আর যদি তিনি মনে স্থির নিশ্চয় হন যে 'এটা চুল নয়, মেঘই'—সেখানে উপমানের চেয়ে উপমেয়ই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে বেশি। সেইজন্যে সেটা তখন হবে নি শ্চ য় অলঙ্কার ॥

**ভ্রান্তিমান ঃ** অন্ধকার রাত্রিতে পথ চল্‌তে চল্‌তে পথিকের দড়ি দেখে সাপ বলে ভুল হয়, ভীতুলোকের কলাগাছ দেখে পেত্নী-বৌ বলে ভুল হয়। কিন্তু এসব নিতান্ত সাধারণ ভুল—এতে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব নাই ॥

কিন্তু চন্দনতরুকে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধিকা ভেবে আলিঙ্গন করছেন, শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যাম গাত্রবর্ণ দেখে ময়ূরী যখন মেঘ ভেবে আনন্দে নৃত্য করছে—তখন এই সমস্ত ভুলের মধ্যে আছে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব ॥

তাই, সাদৃশ্য দেখে একটি জিনিষকে যদি অন্য জিনিষ বলে ভুল হয় এবং সেই ভুল নিতান্ত সাধারণ ভ্রম না হয়ে যদি কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব মণ্ডিত হয়, তবে হবে ভ্রা ন্তি মা ন অলঙ্কার ॥

উদাহরণ ঃ

আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।

নীলপদ্ম ভাবি লুবুধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥ —চণ্ডীদাস।

শ্রীরাধিকার চোখ দুটিকে নীলপদ্ম ভেবে ভ্রমর লুব্ধভাবে ছুটে চলেছে। ভ্রমরের এই ভ্রমের মধ্যে আছে কবিকল্পনার লীলা। তাই ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের সার্থক উদাহরণ হিসাবে এটিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

আরেকটি সমশ্রেণীর উদাহরণ ঃ

এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতার জলসেচন আরম্ভ করিলেন।
এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল।
জলসেচ করিবামাত্র মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া বিকশিত
কুসুমভ্রমে শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখ-কমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম
করিল। —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

**অতিশয়োক্তি ঃ** উপমান এবং উপমেয়ের সাদৃশ্য বা সাম্য বা অভেদ যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন উপমেয় থাকে অপ্রকাশিত, শুধু ব্যঞ্জনায় থাকে তার অপ্রকাশ অস্তিত্ব। এই রকম ক্ষেত্রে হয় অ তি শ য়ো ক্তি অলংকার ॥

যেমন, ধরা যাক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়—

এই পঙক্তি দুটি। এখানে বিদ্যাসাগর এবং তাঁর মনের তেজ উপমেয় ; উপমান সাগর এবং অগ্নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর এবং তাঁর মনের তেজের উল্লেখ এই পঙ্‌ক্তি দুটির কোথাও নাই—আছে একমাত্র তাদের উপমান সাগর এবং অগ্নির। উপমেয়ের অস্তিত্ব শুধু ব্যঞ্জনায়। মনে হচ্ছে উপমানই যেন প্রধান। একেই বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ॥

আরো উদাহরণ ঃ

বন থেকে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

লক্ষ্যণীয়, এখানে তুলনা দেওয়া হচ্ছে আনারসের সঙ্গে সোনার টোপর-পরা টিয়ের। কিন্তু আনারস আছে নেপথ্যে অনুক্ত, উপমানটিই প্রধান।

মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা।                —রবীন্দ্রনাথ।

বৃষ্টিভেজা এস্‌প্ল্যানেডে মধ্যরাতে ঘন অন্ধকার
দুটো তীব্র চোখের বর্শায়
আঁধার বিদীর্ণ ক'রে ছুটে চলে উদ্ধত স্পর্ধায়
চতুষ্পদ শ্বাপদ ভীষণ।

মোটর গাড়ীকে তুলনা দেওয়া হচ্ছে চতুষ্পদ শ্বাপদের সঙ্গে, হেড্‌লাইট দুটির তুলনা দুটো বর্শা। কিন্তু উপমেয়ের উল্লেখ নাই, উপমানই প্রধান॥

আরেকটি উদাহরণ ঃ

দু চোখে মেঘের ঘটা, আসন্ন বৃষ্টির আয়োজন,
কোথায় আশ্রয় পাব, যদি নামে প্রবল বর্ষণ ?

**ব্যতিরেক ঃ** উপমানের চেয়ে উপমেয়কে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করে দেখানো হলে তাকে বলা হবে ব্য তি রে ক অলঙ্কার॥

যদি বলি,

নয়ন তব নিকষ ঘন মেঘের চেয়ে কালো
তাহারে বাসি ভালো—

তখন চোখের তুলনা কালো মেঘ, কিন্তু উপমেয় চোখকে মেঘের চেয়েও কালো বলায় উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখানো হল। তাই এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার।

তেমনি কবি যখন বলছেন—

বাতাসের চেয়ে স্বচ্ছ তোমার সে প্রত্যাশাকে নিয়ে
বসে থাকা শেষ হয়ে গেছে                —জীবনানন্দ দাশ।

কিংবা—

গোলাপের চেয়ে লাল
তোমার কামনা

অথবা—

নবীননবনীনিন্দিত করে

দোহন করিছ দুগ্ধ —রবীন্দ্রনাথ।

তখন সবগুলিতেই উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ বোঝানো হচ্ছে ॥

উপমানের চেয়ে উপমেয়ের অপকর্ষ বোঝালেও বিপরীত ভাবের ব্যতিরেক হবে। যেমন,

তার কণ্ঠস্বর ব্যাঙের গলার চেয়েও কর্কশ।

এখানে উপমান ব্যাঙের কণ্ঠস্বর। উপমেয় 'তার গলার স্বর'। কিন্তু উপমানের চেয়ে উপমেয় এখানে নিকৃষ্ট। তাই এটি অপকর্ষসূচক ব্যতিরেকের উদাহরণ।

এল ওরা—
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,—
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে
—রবীন্দ্রনাথ।

উদ্যত ফণা সর্পের চেয়ে নগ্ন জিঘাংসায়
ভায়ের বক্ষে ভাই ছুরি হেনে যায়—
সাপের বিষকে লজ্জা দিয়েছে জাতি-ভেদাভেদ বিষ
গোটা দেশ সেই বিষম জ্বালায় জ্বলিছে অহর্নিশ। —অ. ম.।

**প্রতীপ ঃ** উপমানকেই যদি উপমেয় হিসাবে কল্পনা করা হয়, কিংবা উপমেয়ের গুণোৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্বের ফলে উপমানকে নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিহার করা হয় তবে সেখানে হবে প্র তী প অলঙ্কার ॥

সাধারণত চুলকেই তুলনা দেওয়া হয় মেঘের সঙ্গে। 'মেঘ সম কুন্তল' এইটাই স্বাভাবিক এবং প্রচলিত। কিন্তু কবি যদি বলেন—

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

তবে কুন্তলকে মেঘের সঙ্গে তুলনা না দিয়ে মেঘকেই (অর্থাৎ সাধারণত যেটাকে উপমান হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাকে-ই) কুন্তল হিসাবে (উপমেয়

হিসাবে ) ধরা হচ্ছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বগুণে মেঘ কুন্তলের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এই রকম ক্ষেত্রে হয় প্রতীপ অলঙ্কার ॥

আরেকটি উদাহরণ ঃ

কান্না-ধোওয়া দুটি চোখের মত
বৃষ্টিধৌত পদ্ম দুটি পাপড়ী মেলে তাকালো,
আশ্বিনের এই স্নিগ্ধ ভোরে।

সাধারণত পদ্মের সঙ্গেই তুলনা দেওয়া হয় চোখের। কিন্তু এখানে বৃষ্টিধোওয়া পদ্মকেই তুলনা দেওয়া হয়েছে অশ্রুতে ভেজা চোখের সঙ্গে।

**সমাসোক্তি ঃ** কবিরা অনেক সময় অচেতন বস্তুর ওপর চেতন বস্তুর কিংবা চেতন বস্তুর ওপর অচেতন বস্তুর ব্যবহার আরোপ করেন। একে বলে প্রস্তুতের ওপর অপ্রস্তুতের কিংবা অপ্রস্তুতের ওপর প্রস্তুতের ব্যবহার আরোপ। আলঙ্কারিক নাম স মা সো ক্তি ॥

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটিতে বসুন্ধরাকে কল্পনা করা হয়েছে রমণী হিসাবে। বসুন্ধরা অচেতন বস্তু, রমণী চেতনাসম্পন্না প্রাণী। রমণী যেভাবে বুকে আঁচল টেনে এলোচুলে ভাবে বিভোর হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে—কবির কল্পনায় রমণীর সেই ব্যবহার অচেতন বস্তু পৃথিবীর ওপর আরোপিত হয়েছে। সেইজন্য একে বলা হবে সমাসোক্তি অলঙ্কার ॥

অন্যান্য উদাহরণ ঃ

ছোটো ছোটো মেঘ দলে দলে
হাজার ধবলী স্থির, চলে নাকো, কার বাঁশী শোনে
কার নীলজলে কিবা তরল সঙ্গীত এই সবে স্নান সেরে।

—বিষ্ণু দে।

একটি নক্ষত্র আসে ; তারপর একা পায়ে চলে
ঝাউয়ের কিনার ঘেঁষে হেমন্তের তারাভরা রাতে
সে আসবে মনে হয় ; আমার দুয়ার অন্ধকারে
কখন খুলেছে তাঁর সপ্রতিভ হাতে !
হঠাৎ কখন সন্ধ্যা মেয়েটির হাতের আঘাতে
সকল সমুদ্র সূর্য সত্বরতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি হ'তে পারে
সে এসে দেখিয়ে দেয়। —জীবনানন্দ দাশ।

হঠাৎ রোদের দিকে মেঘের ঢাল উঁচিয়ে
এক ঝাঁক বৃষ্টির তীর নেমে এলো। —শোভন সোম।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা
দিনের কল্লোল-'পর টানি দিলি ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা। —রবীন্দ্রনাথ।

ত্রস্তবাস টেনে ঝাউবন
বাতাস সরিয়ে দিয়ে এতক্ষণে সূর্য নিল কোলে
সময় হয়েছে জেনে। সময় কি হয়েছে এখন ?
চোখ তুলে দীঘিবউ ফসলের ক্ষেতকে শুধালো ;
তারপর শান্ত হাতে খুলে নিলো বুকের বসন
সরবতের মতো তার স্তনে মুখ রেখে দিলো আলো
শিশুর মতন হয়ে। —বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এগুলি সবই হল অচেতন বস্তুতে চেতনের আরোপ। এইবার দেখা যাক চেতন বস্তুতে অচেতনের ব্যবহার আরোপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এর চমৎকার উদাহরণ পাই এই কটি পঙক্তিতে—

এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—

পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারই জীবনবনে 'সৌন্দর্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি ?

এখানে চেতন বস্তু মানসসুন্দরীর ওপর অচেতন বস্তু লতার ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি•
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী —রবীন্দ্রনাথ।

**প্রতিবস্তূপমা ঃ** যাকে তুলনা করা হচ্ছে এবং যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সে দুটি জিনিষ যদি দুটো আলাদা বাক্যে থাকে, তাদের সাধারণ ধর্ম এক হলেও যদি তাদের আলাদা ভাষায় প্রকাশ করা হয়, আর সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকে অনুল্লিখিত—তবে সেই অলঙ্কারকে বলা হবে প্র তি ব স্তূ প মা ।।

জিনিষটা কিরকম তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। রবীন্দ্রনাথের একটি বাক্য নেওয়া যাক—

সাত্ত্বিকের ঠিক উল্টো পিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্যপারে
অমাবস্যা।

এখানে সাত্ত্বিকের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে পূর্ণিমার, তামসিকের সঙ্গে অমাবস্যার। তুলনীয় বস্তু এবং তুলনার বস্তু দুটি আছে আলাদাভাবে ; সাত্ত্বিকতার এবং পূর্ণিমার নির্মলতা, তামসিকের এবং অমাবস্যার কৃষ্ণত্ব সাধারণধর্মে এক ; আর এই দুটি তুলনায় মত, ন্যায়, যেন ইত্যাদি কোন সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। সেইজন্য প্রতিবস্তূপমার এটি একটি নিখুঁত উদাহরণ হতে পেরেছে ।।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর ; নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার ; জানেও না

কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনক কিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়। —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে উপমেয় রাজা বিক্রমদেব, উপমান সূর্য। রাজার কৃপাবর্ষণ এবং সূর্যের আলোকবিতরণ সাধারণধর্মে এক, কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দ নাই। আবার রাজার কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সূর্যালোকে ফুটে ওঠা বনফুল যথাক্রমে উপমেয় এবং উপমান। সাধারণধর্ম ধন্য হওয়া ( ব্যক্তির রাজার কৃপা পেয়ে, এবং বনফুলের সূর্যের কিরণে ফুটে ওঠায় )। সাদৃশ্যবাচক শব্দ অনুল্লিখিত ॥

**দৃষ্টান্ত ঃ** যদি দুটো আলাদা বাক্যে উপমান ও উপমেয় থাকে, আর তাদের সাধারণধর্ম তাৎপর্যে আলাদা হলেও যদি সদৃশ বলে মনে হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকে অনুল্লিখিত, তবে হয় দৃ ষ্টা ন্ত ॥

দৃষ্টান্ত অলঙ্কার উপমেয়, উপমান, উপমেয়ের সাধারণধর্ম এবং উপমানের সাধারণ-ধর্মের ভাব এত সদৃশ যে একটাকে আরেকটার প্রতিবিম্ব বলে মনে হয় ॥

বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে একটি উদাহরণ ঃ

অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিফলে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে ॥

এখানে উপমেয় নবযৌবন আর বিরহের জ্বালা। উপমান নব অঙ্কুর এবং তপন-তাপ। এই দুটি আছে দুটি আলাদা বাক্যে। বিরহের যন্ত্রণা এবং সূর্যের দহন সাধারণধর্মে খুব স্পষ্ট নয়, তবুও সূর্যের তাপে অঙ্কুর শুকিয়ে যাওয়া এবং বিরহের আগুনে নবযৌবন শুকিয়ে যাওয়া সদৃশ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোথাও সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়নি।

সুতরাং একে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলতে বাধা নাই। এই উদাহরণটিতে অঙ্কুর এবং নবযৌবন, সূর্য এবং বিরহের জ্বালা, মেঘ এবং প্রিয়া—এদের সাধারণধর্ম যদি এক এবং পরিস্ফুট হতো, তবে অলঙ্কারটি হয়ে যেত প্রতিবস্তূপমা ॥

আরো কয়েকটি উদাহরণ ঃ

মনোভাব

যতক্ষণ মনে থাকে, দেখায় বৃহৎ ;
কার্যকালে ছোট হয়ে আসে। বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে এক ফোঁটা জল। —রবীন্দ্রনাথ।

ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে ডালি,
এ দেহে যৌবন প্রিয় রাখি কত কাল ?
—লোকগীতির অনুসরণে।

একবার, তবু একবার সেই চির-প্রোজ্জ্বল আলোর দেশে
চেতনা আমার পেয়েছিল আশ্রয়,
হৃদয়, তুমিই দিয়েছিলে বরাভয় ;
শীতের তুষার গ'লে হ'লো হ্রদ ভীষণ বিস্ফোরণে,
হলুদ পাতার পাণ্ডুর মুখে বসন্ত খেলো চুমু
একবার, সে তো একবার। —বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এখানে ৭ই নভেম্বরের রুশবিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। জনতার জাগরণ আর তুষার গলে-যাওয়া ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক।

উপরের কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয় সমজাতীয় আরেকটি কবিতাংশ—

আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনকফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল,
মৃত্যুকপিশ মূর্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি !
উলু উলু উলু দে রে পুরনারী, ওরে তোরা শাঁখ বাজা
অন্ধকারায় জন্মিল আজ মুক্তিদেশের রাজা। —যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা বলা হচ্ছে।

**নিদর্শনা ঃ** প্রকৃত এবং অপ্রকৃত অর্থাৎ বর্ণনীয় এবং বর্ণনার বহির্ভূত দুটো বস্তুর সম্বন্ধ, উপমা কল্পনা না করলে বোঝা যায় না এমন যদি হয়, তবে তাকে বলে নি দ র্শ না। এই বস্তু দুটির সম্বন্ধ সম্ভব-অসম্ভব দুই-ই হতে পারে॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রায়, সিং ও ঘাটে ( এবং আজিজুল )' গল্পের থেকে একটি বাক্য নিচ্ছি উদাহরণ হিসাবে।

> অমন প্রচণ্ড গতির বেগেও রায়ের বসন্ত চিহ্নিত মঙ্গোলীয়ান হল্‌দে মুখখানা চিতা বাঘের মত লাইটারের আলোয় মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠল।

এখানে বর্ণনীয় বিষয় রায়ের মুখ। সে মুখ বসন্ত চিহ্নিত, হল্‌দে, মঙ্গোলীয়ান। সে মুখের তুলনা চিতাবাঘের মুখ। কিন্তু মানুষের মুখ চিতাবাঘের মত হয় না—এটি অসম্ভব সম্বন্ধ। কিন্তু উপমা কল্পনা করলে চমৎকার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। রায়ের মুখ বসন্ত-চিহ্নিত, চিতাবাঘের মুখে কালো কালো বিন্দু; রায়ের মুখ হলদে, চিতাবাঘের মুখও হল্‌দে; রায়ের মুখ মঙ্গোলীয়ান অর্থাৎ চোখ ছোট, নাক চাপা, চিতাবাঘেরও তাই। সর্বোপরি আছে রূপক চিতাবাঘের হিংস্রতা ও রায়ের হিংস্রতা সমধর্মী। কিন্তু এই অসম্ভব সম্ভব সম্বন্ধ উপমা কল্পনা না করলে স্পষ্ট হয় না। সেইজন্য নিদর্শনা অলঙ্কার এটি একটি সার্থক উদাহরণ।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

> চাঁপা কোথা হতে এনেছে হরিয়া
> অরুণ কিরণ কোমল করিয়া ?

চাঁপার রঙ একরকম, সূর্যের কিরণের রঙ অন্যরকম। দুটোর মধ্যে অসম্ভব সম্বন্ধ। কিন্তু চাঁপা ফুলের দীপ্তি অরুণালোকের মত, এই রকম উপমা কল্পনা করলে তবে সম্বন্ধটা বোঝা যায়॥

> কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যতদূর ছিল, এখন তা নাই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

অপরিমার্জিত বাস্তবতাকে রসলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় না-ছাড়া আর স্বর্গারোহণের সময় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গের কুকুরটিকে না ছাড়া—অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ। কিন্তু উপমা কল্পনা করলে সম্বন্ধটি স্পষ্ট॥

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত এবং নিদর্শনা এই তিনটি জিনিষের পার্থক্যগুলি মনে রাখলে তিনটি অলঙ্কার চিনতে সুবিধা হবে।

প্রতিবস্তূপমায় উপমেয় এবং উপমানের সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে বলা হয় না, মর্ম-আলোচনাকালে তবে তা স্পষ্ট হয় ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহার হয় না ; উপমেয় এবং উপমান পৃথক পৃথক বাক্যে ব্যবহৃত হয় ; উপমেয় এবং উপমানের সম্বন্ধ সেখানে সম্ভব ॥

দৃষ্টান্তে উপমান ও উপমেয় থাকে দুটো আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর-নিরপেক্ষ বাক্যে ; সাদৃশ্য বস্তুত পৃথক, কিন্তু মর্ম-আলোচনা করলে মিল পাওয়া যায় ; সাদৃশ্য-বাচক শব্দ অনুল্লিখিত ; বস্তু দুটির সম্বন্ধ সর্বদাই সম্ভব ॥

নিদর্শনায় উপমা কল্পনা না করলে বর্ণনীয় ও বর্ণনার-বহির্ভূত বস্তু দুটির সম্বন্ধ বোঝা যায় না ; একটি বাক্যে বা দুটি বাক্যে পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় উপমেয় এবং উপমান থাকে ; উপমেয় এবং উপমানের বস্তুসম্বন্ধ অসম্ভব, কিন্তু উপমা কল্পনা করলে তা সম্ভবে পরিণত ; সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হতেও পারে, নাও পারে ॥

### ।। বিরোধমূলক অর্থালঙ্কার ।।

অর্থালঙ্কারের শাখা পাঁচটি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি শাখা—সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের মোটামুটি আলোচনা সম্পন্ন হল।

এখন দ্বিতীয় শাখা—বিরোধমূলক অলঙ্কারের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলির কথা বলা হবে।

বিরোধ কথাটির চলিত মানে ঝগড়া, অমিল, সাদৃশ্যের অভাব। শিল্পীরা তাঁদের রচনায় যে বিরোধ ব্যবহার করেন, তা আসলে অমিল নয়—তা কৃত্রিম, কল্পিত সাদৃশ্যের অভাব এবং তা ব্যবহার হয় বর্ণনীয় বিষয়কে একটা আলাদা সৌন্দর্য দেবার জন্যে। বক্তব্য বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে বিরোধটি নিতান্তই কল্পিত বস্তু ॥

কবিগুরু বললেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। পঙক্তিটি হঠাৎ পড়লে মনে হয় বন্ধনের মাঝে আবার মুক্তি কি? বন্ধন এবং মুক্তি ত দুটি বিরুদ্ধ জিনিষ। কিন্তু এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, সমস্ত বাঁধন মানলেই তবে মুক্তি পাওয়া যায়। বন্ধন এবং মুক্তি বিরুদ্ধ জিনিষ হলেও এখানে দুটিতে বিরোধ নাই, এখানে দুটি জিনিস পরস্পরের পরিপূরক। বক্তব্য বিষয়কে শক্তিশালী দীপ্তিময় ও সৌন্দর্যযুক্ত করতে এর ব্যবহার ॥

বিরোধমূলক অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান : বিরোধ ( বা বিরোধাভাস ), বিষম, অসঙ্গতি, বিভাবনা, বিশেষোক্তি ইত্যাদি ॥

**বিরোধ :** যেখানে দেখা যায় আপাতবিরোধ, কিন্তু তাৎপর্য বিশ্লেষণের পর বিরোধ অবসান হয়—তাকে বলে বি রো ধ বা বি রো ধা ভা স ॥

অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাগতি ।

অচক্ষুর দেখতে পাওয়া, অকর্ণের শুনতে পাওয়া এবং অপদের সর্বত্র যাওয়া সম্ভব নয়, এগুলি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু অচক্ষু, অকর্ণ এবং অপদ—সবই ভগবানের বিশেষণ, সুতরাং বিরোধটা বাহ্যিক, তত্ত্বের দিক থেকে কোন অমিল নাই।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
—গোলাম মোস্তাফা।

শিশুর মধ্যে শিশুর পিতা কি করে থাকবে ? কিন্তু তাৎপর্য এখানে এই—আজ যে শিশু, সে একদিন শিশুর পিতা হবে। সেই জন্যে যে শিশু, সে-ই আবার শিশুর পিতা।

অন্যান্য উদাহরণ :

কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই। —রবীন্দ্রনাথ।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। —রবীন্দ্রনাথ।

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান—নজরুল ইসলাম।

সবার আসঙ্গ লভি সবার বিরহে —অন্নদাশঙ্কর রায়।

লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন অলঙ্কার করেছি গায়
চল সজনী যাই গো নদীয়ায়। —অজয় ভট্টাচার্য।

শ্রান্তিহীন রক্তের অসুখে
বিবর্ণ সান্নিধ্য আনে অস্বস্তির আমৃত্যু সান্ত্বনা।
—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**বিভাবনা ঃ** প্রসিদ্ধ কারণ না থাকা সত্ত্বেও যেখানে কার্যের উৎপত্তি হয়, সেখানে হবে বি ভা ব না অলঙ্কার ॥

চোখ বন্ধ করলে কোন জিনিষ দেখা যায় না, কান বন্ধ করে রাখলে যায় না শোনা। কিন্তু রাধিকা যখন দুই চোখ বন্ধ করে রাখলেও কৃষ্ণের শ্যাম রূপ সর্বত্র দেখতে পান, দুই হাত দিয়ে কান বন্ধ রাখলেও শুনতে পান তাঁর মুরলীধ্বনি, তখন বুঝতে পারি, তাঁর অনুরাগ ইন্দ্রিয়ের বাধ্য নয়। ইন্দ্রিয় বিরোধিতা করলেও অনুরাগের আনুকূল্য সেই বিরোধ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাই পল্লীকবি যখন বলেন—

কমল নয়ন বন্ধ করি তবু সে নিঠুর
কালার কালো রূপের শোভা হয়না ত রে দূর—
দু'হাত দিয়া বন্ধ করি আমার পোড়া কান
তবু কালার বাঁশীর ধ্বনি পোড়ায় মোর পরাণ।

তখন নিজের অজ্ঞাতে তিনি ব্যবহার করেন বিভাবনা অলঙ্কার ॥

অন্যান্য উদাহরণ ঃ

তাইত তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি। —রবীন্দ্রনাথ।

ভগবান রাজার রাজা। তাঁর কোন কিছুরই অভাব নাই, তবুও তিনি ভক্তের হৃদয় কামনা করেন। সমভাবের কবিতাংশ—

ওহে ত্রিভুবন পতি বুঝি না তোমার মতি
কিছুরই অভাব তব নাহি,
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু
সবার সর্বস্ব ধন চাহি। —রবীন্দ্রনাথ।

দেয়া না আছিলরে বন্ধু তবু আন্ধার নামে
নয়নমণি বিদায় নিলে কলসডিহি গ্রামে ॥
ফোটা-ফোটা আশমান তবু বাজ পড়ে তার চিতে
রঙ্গিলা কান্দিয়া মরে ঘরের পৈঠাতে ॥ —পূর্ববঙ্গের লোক-গীতি।

**বিশেষোক্তি :** কারণ থাকা সত্ত্বেও যেখানে ফলের অভাব সেখানে হয় বি শে ষো ক্তি অলঙ্কার ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে এর একটি চমৎকার উদাহরণ আছে—

যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ
অনল আমারে নাহি দহে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মরণ যে বাসে ভয়
কালা যার হিয়া মাঝে রহে।

বিষপান করলে সকলেই মরে, অনল সবাইকেই দগ্ধ করে। কিন্তু শ্রীরাধার হৃদয়ে কানুর বসতি থাকায় তিনি বিষ পান করলেও, অনলে ঝাঁপ দিলেও মৃত্যু হয় না ; কারণ সত্ত্বেও কার্য বা ফলের অভাব হচ্ছে।

আরেকটি উদাহরণ :

তাই আঘাতে অটল
আমাকে পারে না মুছ্‌তে মারী কি চক্রান্ত
কিংবা তিমিরের অপচয় ; মৃত্যু ছিঁড়ে
রক্তস্নাত, তবু মাগো জন্মে জন্মে ফিরে আসি
তোমারই কুটিরে। —বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধারণত সবাই আঘাতে ভেঙে পড়ে, মহামারী কি চক্রান্তে পৃথিবী থেকে মুছে যায়, কিন্তু বাংলা-মার সন্তান এই কবি এই কারণগুলি থাকলেও ফলগুলি তাঁকে ভোগ করতে হয় না। আঘাতে তিনি থাকেন অটল, মারী কি চক্রান্ত তাঁকে মুছতে পারে না, মৃত্যু ছিঁড়ে তিনি বাংলা মার কুটিরে জন্মে জন্মে ফিরে আসেন।

অন্য একটি উদাহরণ :

আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তাহে শব্দ নাহি ধায় ॥ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

চোখ আছে, দেখা যায় না ; কান আছে, শোনা যায় না। কারণ আছে কিন্তু ফল নাই। থাকবে কেমন করে--কারণ বলা হচ্ছে বার্ধক্যের কথা। বৃদ্ধকালে লোক চোখ থাকলেও অন্ধ, কান থাকলেও বধির ॥

**অসঙ্গতি** ঃ কার্য এবং কারণ আলাদা আলাদা থাকলে, অর্থাৎ এক আশ্রয়ে কার্য এবং অন্য আশ্রয়ে কারণ থাকলে হয় **অ স ঙ্গ তি অলঙ্কার** ॥

তুই হাসলে সূয্যি হাসে ফুল ফোটে বনেও
নেচে ওঠে বিয়েবাড়ীর কনেও
তুই কাঁদলে বিষ্টি নামে মিষ্টি মায়ের মনেও
কান্না রঙের পেখম ছড়ায় বিকেল রঙের রোদ্দুর
তুই ঘুমুলে সব নিঝ্‌ঝুম, তুই জাগলে মেঘ দূর।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিশু হাসলে যে আনন্দ তা তার মধ্যেই থাকা উচিত, কিন্তু হেসে উঠছে সূর্য, বনের ফুল। কারণ এক জায়গায়, কার্য আরেক জায়গায়। শিশু কাঁদছে, কিন্তু বেদনা মায়ের মনে। এখানেও কারণ ও কার্যের আশ্রয় বিভিন্ন। তাই এক্ষেত্রে এটি অসঙ্গতি অলঙ্কারের উদাহরণ বলতে বাধা নাই।

আরো কয়েকটি উদাহরণ ঃ

যবে তুমি গেলে চলে প্রাঙ্গন বাহিরে পথ বাহি
উপেক্ষায়, অভিমানে একবারও পিছনে না চাহি—
আমার বক্ষের পরে হানে তীব্র বেদনা আঘাত,
তব দৃঢ় দৃপ্ত পদপাত।

পদপাত হয় ধরণীতে, ব্যথা লাগার কথা সেখানে , কিন্তু বেদনাবোধ কবির হৃদয়ে। কারণ এক জায়গায়, কার্য অন্যত্র।

হৃদয় মাঝে মেঘ উদয় করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি ॥ —জ্ঞানদাস।

মেঘ উঠছে হৃদয়ে, বৃষ্টি হচ্ছে নয়নে। হৃদয়ে অনুরাগের মেঘ, নয়নে প্রেমের অশ্রু। কারণ ও কার্যের বিভিন্ন আশ্রয় লক্ষণীয়।

আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে —রবীন্দ্রনাথ।

**বিষম ঃ** কারণ ও কার্যের বৈষম্য বা প্রতিকূলতা দেখা গেলে, কারণ থেকে আশানুরূপ ফল না হয়ে অবাঞ্ছিত ফল দেখা দিলে, কিংবা বিসদৃশ বস্তুর একই আধারে মিলন হলে হবে বি ষ ম অলঙ্কার ॥

শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি ॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে ॥
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মানিক হারানু হেলে ॥

চাঁদের সেবা করতে গিয়ে ভানুর কিরণ-জ্বালা পাওয়া, পাহাড়ে উঠে সমুদ্রে পড়া, লক্ষ্মী চাইতে দারিদ্র্য পাওয়া—কারণ থেকে আশানুরূপ ফল না হয়ে অবাঞ্ছিত ফল পাবার উদাহরণ।

সমভাবের কবিতা আছে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে—

জনম দুখিনী আমি দুঃখে কাটে কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙে সেই ডাল ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ॥

আরেকটি উদাহরণ ঃ

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনি, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা-গণনার অতীত প্রত্যূষে— —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে একই আধার পৃথিবীতে স্নিগ্ধতা, হিংস্রতা, পুরাতন এবং নিত্যনবীন—এই সমস্ত একান্ত অসম্ভব বস্তুর মিলন হয়েছে। একেও বিষম অলঙ্কার বলতে পারি।

দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্রতেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

এখানে কারণ দুঃখের মন্থন, অথচ কার্য হচ্ছে অমৃতের উত্থান। কারণ রৌদ্র তেজের দাহন, কার্য বরফ গলে নির্ঝর হওয়া। এখানে কারণ ও কার্যের বৈষম্য ॥

## ॥ শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কার ॥

কোন কোন অর্থালঙ্কার বাক্যাংশের যোজন-শৃঙ্খলাকে অবলম্বন করে থাকে। জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টির জল, বৃষ্টির জল থেকে প্লাবন—সমস্ত জিনিষটা একটা শৃঙ্খলা মেনে চলেছে। মেঘ থেকে রোদ বললেই শৃঙ্খলা কেটে যাচ্ছে। শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কারে এই যুক্তি এবং শৃঙ্খলা মেনে নিয়েই বাক্যে সৌন্দর্য ও অর্থগৌরব সৃষ্টি করা হয় ॥

শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কারের মধ্যে আছে কারণমালা, একাবলী, সার ॥

**কারণমালা** ঃ একটি কারণের কার্য যদি পরবর্তী কার্যের কারণ হয় আর এইভাবে যদি কার্যকরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলতে থাকে, সেখানে হয় কা র ণ মা লা অলঙ্কার ॥

বাষ্প হতে হয় মেঘ, মেঘ হতে জল,
নদীবক্ষে সেই জল সৃষ্টি করে প্লাবন প্রবল ॥

এর কার্য-কারণ পরম্পরা বুঝতে অসুবিধা নাই।

তেমনি—

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

তোমার দুটো কাজল-কালো নয়ন দরশনে
হৃদয় হল সোনা অনুরাগের পরশনে—
জন্ম নিল প্রেম—
তাহারে লয়ে বুকে তোমার দুয়ারে দাঁড়ালেম,
নম্র অবনত,
হায়রে সেই প্রেমের জ্বালা হৃদয় করে ক্ষত
বিরহ অভিশাপে—
এখন বুঝি মরণ মোর শিয়রে একধারে
নীরব রাতি যাপে ॥

প্রথমে কবি দেখেছিলেন প্রিয়ার কাজলকালো চোখ, দর্শন থেকে অনুরাগ, অনুরাগ থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বিরহ,—শেষে বুঝি মরণ।

**একাবলী ঃ** পরের বাক্য বা বাক্যাংশ আগের বাক্য বা বাক্যাংশকে বিশেষিত করলে হয় এ কা ব লী॥

একাবলী বোঝাতে সবাই যে উদাহরণটি ব্যবহার করেছেন সেটি দিয়েই এর বিশ্লেষণ করি—

গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি,
সুন্দর ধরাতল। —যতীন্দ্রমোহন।

এখানে বস্তু তিনটি—গাছ, ফুল, অলি। ফুল বিশিষ্ট হয়েছে গাছের জন্যে, আবার অলি বিশিষ্ট হয়েছে ফুল-সংযোগে। পূর্ববর্তী বস্তু পরবর্তীকে বিশিষ্ট করছে। এইটাই একাবলীর বিশেষত্ব॥

স্নিগ্ধ নীল সরোবর প্রসন্ন নির্মল,
সরোবরে শ্বেতপদ্ম মেলিয়াছে দল,
কমল কুসুমে
ভৃঙ্গ আসি চুমে,
ভৃঙ্গের গুঞ্জনে ওঠে সঙ্গীত চপল
সঙ্গীতে ব্যাকুল মন, মুগ্ধ ধরাতল॥

এখানে সরোবর বিশিষ্ট পদ্মের দ্বারা, পদ্ম বিশিষ্ট ভ্রমরের দ্বারা, ভ্রমর বিশিষ্ট গুঞ্জনের দ্বারা, গুঞ্জন বিশিষ্ট সঙ্গীত সহযোগে। এখানে শৃঙ্খলা-পরম্পরাও লক্ষণীয়।

**সার ঃ** শৃঙ্খলামূলক অর্থালঙ্কারের শেষ ভাগ সার। বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ যে অলঙ্কারের মাধ্যমে বর্ণিত হয়, তাকে বলে সা র॥

যেমন সৃষ্টির সার পৃথিবী, পৃথিবীতে সার চেতন পদার্থ, চেতন পদার্থের সার মানুষ, মানুষের সার পণ্ডিত, পণ্ডিতের সার বিনয়ী—এই রকম যত উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বের করা হবে, ততই প্রতিষ্ঠা পাবে সার অলঙ্কার॥

উদাহরণ ঃ

আমি মনে করি, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ, বাংলাদেশের মধ্যে বাঙালী, আর বাঙালীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথই শ্রেষ্ঠ॥

## ॥ ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার ॥

ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কার বলতে বোঝাবে এমন সব অলঙ্কারের ব্যবহার যার দ্বারা কোন বক্তব্যকে ন্যায়সঙ্গত সমর্থনের সাহায্যে উপস্থিত করা হবে। পৃথিবীতে যার টাকা বেশি আছে সে-ই আরো বেশি টাকা চায় ; যার জীবনে প্রচুর সুখ সে তাতেই সন্তুষ্ট নয়, আরো বেশি সুখের সে প্রত্যাশী ; দরিদ্র মাত্রেই সকলের নিপীড়নের পাত্র ; কামনার দ্বারা কখনও কামনাকে নিবৃত্ত করা যায় না, হিংসার দ্বারা দমন করা যায় না হিংসাকে—এই সমস্ত ব্যাপারই ন্যায়মূলক সত্য। রচনায় যখন এই ধরণের কোন বিষয়কে অবলম্বন করে কোন ন্যায়সঙ্গত সমর্থন অলঙ্কারের আকারে প্রকাশ করা হবে, তখনই হয় ন্যা য় মূ ল ক অর্থালঙ্কার ॥

ন্যায়মূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে প্রধান অর্থান্তরন্যাস ও কাব্যলিঙ্গ ॥

**অর্থান্তরন্যাস ঃ** সামান্য বা সাধারণ বিষয়ের সাহায্যে যেখানে বিশেষ বিষয়কে কিংবা বিশেষ বিষয় দ্বারা সামান্য বিষয়কে অথবা কার্যের দ্বারা কারণ এবং কারণের সাহায্যে কার্যকে সমর্থন করা হয় সেখানে হয় অ র্থা ন্ত র ন্যা স অলঙ্কার ॥

এখানে একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে। সামান্য বিষয় বলতে বোঝাচ্ছে General Statement এবং বিশেষ বিষয় বলতে Particular Statement. মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দেখতে পেলেন বিভীষণই লক্ষ্মণকে সেখানে চোরের মত পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। দেখে দুঃখ হল। তিনি পিতৃব্যকে সম্বোধন করে বললেন—

ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এসকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নিগুর্ণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা ! হেন সহবাসে

হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি ॥

মেঘনাদের চোখে লক্ষ্মণ নীচ—তাঁর সঙ্গে বিভীষণ ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যে আবদ্ধ। সুতরাং তিনি ত এই নীচতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হবেনই। নীচের সঙ্গে যে মেলামেশা করে, সে নীচ হয় এটা general statement বা সাধারণ বিষয়। এই general statementকে মেঘনাদ আরোপ করেছেন particular বিষয় বিভীষণের ওপর। আবার এই আরোপটি একটা ন্যায় বা logic মেনে চলছে। তাই একে আমরা বলব, অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

দুর্বল যদি হাতে অসীম ক্ষমতা পায় তবে তার চেয়ে মারাত্মক আর কিছু নাই। মহারাজ, পুত্রস্নেহে অন্ধ আপনি সেই ক্ষমতা দিয়েছেন দুর্যোধনকে —এর যা ফল তা সবচেয়ে বেশি ভোগ করবেন আপনি ॥

এখানেও 'দুর্বলের হাতে অসীম ক্ষমতা মারাত্মক'—এই সাধারণ বিষয় আরোপ করা হয়েছে বিশেষ বিষয় দুর্যোধনের ওপর। সাধারণের দ্বারা বিশেষের সমর্থন ॥

এবার অন্য একটি উদাহরণ ঃ

মূঢ়, আজও তোর ভ্রান্তি গেল না !
দেখ্‌লি না চোখ মেলে,
মেষপালকের ঘরে ঠাঁই নিল
কুমারীর এক ছেলে !
তবু দেখ তার কর্ম মহান,
প্রেমের ধর্মে মানুষের প্রাণ
জয় করে দেখ্‌ ওড়ালো নিশান
দেশ-মহাদেশ পারে—
জন্ম ত নয়, কর্মই সব
আজো কি বুঝিলি নারে ?

এখানে বিশেষ একটি বিষয় প্রভু যীশুর মহান কর্মের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে জন্মটা কিছু নয়, কর্মই আসল। এক্ষেত্রে বিশেষের দ্বারা সাধারণের সমর্থন ॥

এবার কারণের দ্বারা কার্য সমর্থন :

যত হোক না সে মাতাল, দুষ্ট, পুত্র কুলাঙ্গার,
জননী কি ত্যাগ করে ?
পাঁকে পড়ে দেহ মলিন, তবুও মায়ের হৃদয় তারে
—দুহাতে জড়ায়ে ধরে ॥

মায়ের স্নেহই হচ্ছে কারণ যার দ্বারা পতিত, ঘৃণিত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরার কার্য সম্পন্ন হয়।

এর বিপরীত, কার্যের দ্বারা কারণ সমর্থন :

তৈমুর আর চেঙ্গিস আর এটিলাকে বীর ব'লে
সোনার মুকুট পরাই তাদের শিরে,
প্রভু যীশু থাকে ক্রুশের ওপর চোর ডাকাতের মত
—কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়েছি ঘিরে।

এখানে কবি বলতে চাচ্ছেন, মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার নাই। এই ন্যায়বিচার না-থাকার কারণটি সমর্থিত হচ্ছে তৈমুর-চেঙ্গিস-এটিলা এবং যীশুর প্রতি মানুষের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কার্যের দ্বারা ॥

**কাব্যলিঙ্গ :** কোন বাক্য বা পদের অর্থকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ হিসাবে দেখানো হলে হয় কা ব্য লি ঙ্গ অলঙ্কার। অর্থাৎ কাব্যলিঙ্গতে সোজাসুজি কারণ দেখালে চলবে না, হেতু দেখাতে হবে ব্যঞ্জনা বা suggestion-এর সাহায্যে ॥

হায় কি কুক্ষণে অভাগিনী
হেরিলাম যমুনার তীরে,
নব-জলধর-শ্যামরূপী
বনফুল মালা শোভে শিরে—
সে নীল নবীন মেঘ পাশে
আর্দ্র হলো হৃদয় আমার,
হৃদয়ের দুই কূল ব্যেপে
অনুরাগে নামিল আসার ॥

নব-জলধর-শ্যাম-রূপী শ্রীকৃষ্ণকে যমুনার তীরে দেখতে পাওয়াই শ্রীমতীর কাল হল। সেই নব-জলধর-শ্যাম কৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে শ্রীমতীর হৃদয় অনুরাগে সিক্ত হয়ে গেল। সমস্তই ঘটেছে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্যে ( দেখার হেতু ), কিন্তু সেই হেতুটির উল্লেখ এখানে কোথাও নাই ; হেতুটি বা কারণটি বোঝানো হয়েছে ব্যঞ্জনার দ্বারা।

আরেকটি উদাহরণ ঃ

যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,<br>
কেননা হইবে সুখী সর্বজন তথা,<br>
জগৎ-আনন্দ তুমি······ —মধুসূদন।

সীতা জগৎ-আনন্দ, সেই হেতু তিনি যেখানে পদার্পণ করেন সেখানেই সবাই সুখী হয়। হেতুটি ব্যঞ্জনায় গুপ্ত, প্রকাশ্যে অনুল্লিখিত ॥

## ॥ গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার ॥

কোন কোন কথার বাচ্যার্থ যেমন আছে, তেমনি আছে কোন একটি গূঢ় অর্থ। বক্তা হয়ত সেই গূঢ়ার্থই বাচ্যার্থের ছদ্মবেশে শ্রোতার কাছে উপস্থিত করেন। এই জিনিষটি যখন অলঙ্কারের আকারে সাহিত্যে স্থান পায় তখনই তা হয় গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কার। গূঢ়ার্থমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে প্রধান অপ্রস্তুত-প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি এবং স্বভাবোক্তি ॥

**অপ্রস্তুত-প্রশংসা ঃ** অপ্রস্তুতের ( অর্থাৎ কবির যা বর্ণনীয় বিষয় নয়, তার ) দ্বারা যদি প্রস্তুতের ( বা বর্ণনীয় বিষয়ের ) প্রতীতি কবি জন্মাতে পারেন, তবে হয় অ প্র স্তু ত-প্র শং সা অলঙ্কার। কবি এই অলঙ্কারের ক্ষেত্রে বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে থাকেন নীরব, আর বেশি করে বলেন অবর্ণনীয় বিষয়টি ॥

নানাভাবে এই প্রতীতি কবি পাঠকের মনে সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রথমে দেখা যাক সামান্য অপ্রস্তুত থেকে বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি।

একটি ছোট শ্লোক উদাহরণ হিসাবে নেব।

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা<br>
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

সূর্যের শোকে রাত্রিতে অশ্রুবর্ষণ করলে সূর্য ফিরে আসে না, মাঝ থেকে তারার আলোই ব্যর্থ হয়। তেমনি যা হবার নয়, তার জন্য বৃথা শোক করলে, যেটুকু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেটুকুও কোন কাজে আসেনা। অসম্ভবের ব্যর্থ সাধনায় সমস্ত শক্তি নিষ্ফল হয়ে যায়। সূর্যের শোকে অশ্রুবর্ষণ এবং তারকার ব্যর্থ হওয়া সামান্য ( general ) অপ্রস্তুত—কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় এটা নয়। এই অপ্রস্তুতের বর্ণনা তিনি করছেন পাঠকের মনে অলক্ষ্যে এই প্রস্তুত ( particular ) প্রতীতি দেবার জন্যে যে 'অসম্ভবের সাধনা নিষ্ফল ; তাতে যা সম্ভব তা-ও নষ্ট হয়।' এই শ্লোকটির গূঢ় অর্থই কবির লক্ষ্য, তাই বাচ্যার্থ আমাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠতে পারছে না, বাচ্যার্থই এখানে বিবৃত হয়েছে সত্যি, কিন্তু তা একটা means হিসাবে ; আসল বা end হচ্ছে গূঢ়ার্থ ॥

সমজাতীয় আরেকটি উদাহরণ :

রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।

দিনের আলোয় তারাগুলিকে আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু সেগুলি সমস্তই আছে দিনের আলোর আড়ালে সারা গগন জুড়ে। তেমনি, জীবনের সমস্ত পরমক্ষণের মধুর স্মৃতিগুলি মনের গভীরে ঠিকই থাকে। যার জীবনে এই মধুর পরমলগন এসেছে, সংসারের নানা কর্মের, নানা চঞ্চলতার প্রখর দিবালোক তার জীবন আলোকিত করে রাখলেও মনের আকাশ জুড়ে সেই স্মৃতির নক্ষত্রগুলি অনির্বাণ প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। এখানেও সামান্য অপ্রস্তুতের সাহায্যে বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি করার দিকে কবির লক্ষ্য ॥

এর বিপরীত বিশেষ অপ্রস্তুতের সাহায্যে সামান্য প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি।

মানুষ তাহার ধারালো কুঠারে
মহীরুহ ফেলে ফাড়ি,
তবু সে তাহার ছায়াদান-ব্রত
তিলেক দেয়না ছাড়ি।

উপকার করাই যার জীবনের মূল ব্রত, শত অপকার পেলেও সে সারা জীবন তা-ই করে যাবে—এই সামান্য প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি করাই কবির গূঢ় উদ্দেশ্য।

কিন্তু এ বিষয়ে কবি নীরব। তিনি একটি বিশেষ অপ্রস্তুত—মানুষের গাছ কাটা এবং তবুও গাছের ছায়াদান থেকে বিরত না হওয়া—এরই ওপর জোর দিয়েছেন বেশি।

কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা'বলে কুকুর কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়? —সত্যেন্দ্রনাথ।

এখানেও বিশেষ অপ্রস্তুতের দ্বারা সামান্য প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য॥

তৃতীয় ধরণের অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার সৃষ্টি করা যেতে পারে কার্য অপ্রস্তুত থেকে কারণ প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। এখানে effect গুলির বর্ণনার ওপর জোর দিয়ে cause-এর প্রস্তুতের প্রতীতি প্রতিষ্ঠা।

কারণ বিনু ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥ —বিদ্যাপতি।

শ্রীকৃষ্ণের এই এলোমেলো অস্বাভাবিক কার্য (effect) গুলির কারণ রাধিকাকে দেখে উন্মন হওয়া। সেই কারণ প্রস্তুতের প্রতীতি পাঠকের মনে এনে দেবার জন্যেই কার্য অপ্রস্তুতের জীবন্ত বর্ণনার সমারোহ॥

এইবার কারণ অপ্রস্তুত থেকে কার্য প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি:

যাবার সময়—
পার হয়ে যাচ্ছিলাম
একটি দুটি করে সবক'টি সিঁড়ি।...
হঠাৎ ফিরে তাকালাম... ...
দেখলাম, চোখের জলে ভেজা তোমার চোখ!
দেখা হলো না।

প্রিয়ার অশ্রুভেজা চোখ দেখতে কবি ত আসেননি, দেখতে চেয়েছেন তার প্রেম-ঘন নয়ন। সেই নয়নদুটিই দেখা হলনা ; তাই কবিও যেতে পারলেন না, তাঁকে থেকে যেতে হল। এই অবস্থান কার্যের প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টিই কবির উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যেই কারণ অপ্রস্তুত 'চোখের জলে ভেজা'-চোখ দেখতে পাওয়ার কথা বলা ॥

অপ্রস্তুত থেকে সদৃশ প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি ঃ

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে রাজা বিক্রমদেব বলছেন—'নদী প্রবাহিত হয়, সেই নদী দেশের কল্যাণ করে ; বাতাস বয়ে যায়, সেই বায়ু জীবের জীবন।' এর উত্তরে দেবদত্ত বলছেন ঃ

বন্যা আনে
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।

তাৎপর্য এই যে, নদী জলধারা দিয়ে আর বায়ু জীবের প্রাণ রক্ষা কোরে সকলের কল্যাণ করে। আবার সেই নদীই আনে প্রলয়ংকরী বন্যা, বায়ু আনে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা। তেমনি নারী স্বভাবতই কল্যাণরূপিনী হলেও, কখনও কখনও সে বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সংসারে চরম সর্বনাশ ঘটায়। নদী এবং বাতাসের সর্বনাশা দিকটার দ্বারা নারীর স্বভাবের প্রলয়ংকরী রূপের দিকটা, অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুতের সাদৃশ্য সম্পর্কের সাহায্যে কবি পাঠকের মনে সৃষ্টি করতে চান ॥

এর বিপরীত অপ্রস্তুত থেকে বিসদৃশ প্রস্তুতের প্রতীতি সৃষ্টি ঃ

বনমালা হলো পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥

এখানে বিসদৃশ প্রস্তুতটি এই ঃ পুষ্প, পুণ্যবান কৃষ্ণের বুকে সে বনমালা হয়ে দুলছে ; আর রাধা পুণ্যহীনা। বনমালা এবং পুষ্প, আর রাধার পুণ্যহীনা হয়ে থাকা বিসদৃশ প্রস্তুত ॥

**ব্যাজস্তুতি ঃ** নিন্দার ব্যঞ্জনায় স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা করা বোঝালে হয় ব্যা জ স্তু তি অলঙ্কার ॥

প্রথমে নিন্দার ছলে স্তুতি ঃ

কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥ —ভারতচন্দ্র।

এখানে সাধারণ অর্থ একজন ব্রাহ্মণীর স্বীয় স্বামীর নিন্দা। কিন্তু গূঢ়ার্থ—নিন্দার ছলে প্রশংসা। কুকথা, পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ, দ্বন্দ্ব, গঙ্গা নামে সতা স্বামীর শিরোমণি, পতির ভূত নাচিয়ে ফেরা, পাষাণ বাপ—ইত্যাদির দ্বারা যেমন নিন্দা বোঝানো হচ্ছে তেমনি করা হচ্ছে প্রশংসা এইভাবেঃ কু=পৃথিবী; পঞ্চমুখ=পঞ্চানন শিব; কণ্ঠভরা বিষ=নীলকণ্ঠ শিব; দ্বন্দ্ব=মিলন; ভূত=শিবের অনুচর; না মরে=অমর; পাষাণ বাপ=পার্বতীর পিতা পাষাণকায় হিমাচল॥

জনম হে তব অতি বিপুলে।
ভুবন বিদিত অজের কুলে॥
জনক-তনয়া বিবাহ করি।
ভাসালে জগতে যশের তরী॥

এখানে সাধারণভাবে নিন্দা বোঝাচ্ছে এই শব্দগুলির দ্বারাঃ অজের কুলে= ছাগলের বংশে; জনক তনয়া=পিতার কন্যা, সহোদরা। আবার গূঢ়ার্থে এইগুলিই দশরথনন্দন রামচন্দ্রের প্রশংসা, কারণ তিনি ভুবনবিখ্যাত অজরাজার বংশের সন্তান, হরধনু ভঙ্গ করে জনক রাজার কন্যা জানকীকে বিবাহ করে তিনি জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন॥

তিনি ছেলেমেয়েদের জন্যে টাকা পয়সা কিছুই রেখে যেতে পারেননি।
—কজনাই বা তা পারে।
রেখে গেছেন শুধু কয়েকখানা বই।
—কজনাই বা তা পারে!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উক্তি। আপাত-নিন্দার ছলে এখানে প্রশংসাই করা হচ্ছে। টাকা পয়সার চেয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সৃষ্টি-প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর বইগুলি যে অনেক মূল্যবান, এই অর্থ-ই লেখকের অভিপ্রেত ।।

এবারে প্রশংসার ছলে নিন্দা ঃ

> রঘুবংশ অবতংস, যা করেছ যোগ্য সে তোমার—
> মিত্ররক্ষা সাধুব্রত যুগে যুগে করেছে প্রচার ;
> বিনা অপরাধে মোরে মিত্রহিতে করিলে সংহার,
> ভগবান, এর চেয়ে মহনীয় কিবা আছে আর!

রামচন্দ্রের চরিত্রের সদ্‌গুণগুলি—মিত্ররক্ষা, মিত্রহিতের জন্য যথাসাধ্য করা, এখানে রামের নিন্দায় ব্যবহার করছেন মুমূর্ষু বালী। বিনা অপরাধে মিত্ররক্ষার অজুহাতে তাঁকে হত্যার কথা বলে ধিক্কার দেওয়াটাই এখানে গূঢ়ার্থ ।।

> 'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
> বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলনা উত্তর ;
> বুঝিলাম, সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
> পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
> বসে আসে সিংহাসনে—কবি নয়,—অজর অক্ষর
> অধ্যাপক ;...............
> বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
> পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের কৃমি মাংস খুঁটি ;

—জীবনানন্দ দাশ।

অধ্যাপকদের জ্ঞান-গরিমা-অহংকার-প্রতিষ্ঠা-র প্রশংসার ছলে তাঁদের কাব্য-বোধের অভাবের কথাই নিষ্ঠুরভাবে তীব্র ব্যঙ্গের আকারে গূঢ়ার্থে প্রকাশিত ।।

**স্বভাবোক্তি ঃ** স্বভাবের বা নিসর্গের কিংবা যে-কোন প্রাণীর স্ব স্ব রূপের ও ক্রিয়ার সূক্ষ্ম অথচ চমৎকার বর্ণনার নাম স্ব ভা বো ক্তি। এই বর্ণনা এমনভাবে করতে হবে যাতে যার বর্ণনা করা হচ্ছে তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে ।।

বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি,
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোক মঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবস শর্বরী,
বনে জাগে গান ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

বাংলা দেশের বর্ণনার স্বভাবোক্তি :

ধানের মড়াই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া,
মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
সুন্দর ফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল ; ছোট নদী ; গাঁয়ের নিমছায়া তীর। —অমিয় চক্রবর্তী।

একটি গ্রাম্য দুপুরের স্বভাবোক্তি :

এখনও আশ্বিন আছে ; ক্ষিপ্র-স্রোত নদীর দুধারে
আনত কাশের বনে কানে কানে কথা কয়ে যায়
হলদে নীল প্রজাপতি ; ঘাসে ঘাসে শালিক বুঝিবা
বাদামি নক্‌শায় ঘোরে ফেরে ; ওই দূরে নিরালায়
একাকী বিষণ্ণ মাছরাঙা ; স্থলপদ্মের বোঁটায়
মাকড়সায় জাল বোনে ; অহেতুক খেয়ালের তারে
হঠাৎ খুশীর সুর তুলে নাচে চকিত খঞ্জনা :
অবসন্ন বাতাসের আলিঙ্গনে নিজেকে হারায়
স্বচ্ছ মেঘ ; মাঠে মাঠে অফুরন্ত ধানের বিস্তার ;
ইতস্তত স্মিত মুখে ঘোরে, দেখে কিষাণ-অঙ্গনা ;
শিশু হাসে, খেলে, নাচে, কথা কয়, সস্নেহ তাড়না
ক'রে কোলে টেনে চুমো খায় পিতামহ ; একপাশে
আলস্যে দুচোখ বুজে ঘুম যায় ঘরের কুকুর ;
ওপাশে জলের ঘটি ; তামাকের ধুঁয়ো এলোমেলো
ঘুরে ঘুরে ঊর্ধমুখী ; বাঁশিতে মাদলে শান্ত সুর ॥ —অ. ম.।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ছন্দ
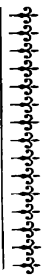
## ।। গোড়ার কথা ।।

ছোট ছেলেকে মা যখন ঘুম পাড়ান, তখন তাকে কোলে নিয়ে মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় দেন আর গান করেন। গানের তালে তালে যে মৃদু আঘাত শিশুর কপালে পড়ে তাতেই সে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে যায়। যে-মা গান গাইতে পারেন না, তিনি বলেন ছড়া ; আর সেই ছড়ার তালে তালে পড়ে সস্নেহ কোমল মৃদু চাপড়। আমাদের সকলের শিশুকালে মায়ের কাছে এই রকম আদর আমরা পেয়েছি— এবং এই আদরের দোলনাতে দুলে দুলেই আমরা ঘুমের রাজ্যে স্বপ্নের সাতমহলা প্রাসাদে প্রবেশ করেছি ॥

কত হাজার হাজার বছর আগে যে মায়েরা শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে গান করা আর ছড়া বলা শুরু করেছিলেন জানি না। কবিতা, গান, ছড়া রচনা কবে যে মানুষ রচনা করতে আরম্ভ করেছে কেউই তা বলতে পারবেন না ॥

কিন্তু একথাও ঠিক, মানুষ সামাজিক প্রয়োজনে এবং নিজের জীবিকার তাগিদে কথা বলতে শিখলেও এবং ভাষার জন্ম দিলেও চিরদিন প্রয়োজনের গতানুগতিক বাঁধাপথে সে হাঁটেনি। জ্ঞানবুদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যেমন নিজের দেহকে করেছে সজ্জিত পাখীর পালকে, পশুর হাড়ে, নিহত প্রাণীর চামড়ায় ; নিজের তৎকালীন বাসস্থান গুহাগুলির দেওয়ালকে করেছে বিচিত্র নানা রেখাচিত্রের সমাবেশে ; শেষে নিজের মুখের কথাকেও দিয়েছে নানা অলঙ্কারের আভরণ—তেমনি কোন এক সময় সে মুখের সোজা খাড়া নিতান্ত সাদামাঠা কথাগুলিকেও দিয়েছে দুলিয়ে ছন্দের দোলনে, সৃষ্টি করেছে আশ্চর্য এক বেগের আবেগ ॥

কেন মানুষের মনে এই পাগলামী এল বলা কঠিন। তবে এটুকু নিরাপদে বলা চলে, কথা বলতে বলতে মানুষ দেখেছে কথার যেমন আছে অর্থ তেমনি আছে ধ্বনি, বা Sound। এই ধ্বনির আবেদন সব আগে তার কানে, আর মানের আবেদন পরে, তার মনে। মুখের কথার এই ধ্বনির যাদুকরী বাঁশি তাকে আরেক স্বপ্নের দুয়োর খুলে দিয়েছে। এই ধ্বনি নিয়ে খেলা করতে করতেই হয়ত সে কোন্

এক সময় দেখেছে ধ্বনির মধ্যে এক আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর শক্তি আছে লুকিয়ে। সেই শক্তির আধিপত্য সে স্বীকার করল—কাজের সময়ে বা অকাজে, প্রয়োজনের সময় বা নিতান্ত অপ্রয়োজনে সে এই ধ্বনি নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ সন্ধান পেল ধ্বনির প্রাসাদে লুকানো রাজকন্যা, সুরের। এই সুরকে যখন সে ধরতে পেরেছে তখন আস্তে আস্তে ধরা দিয়েছে তাল, সুরের ওঠানামা, সুরের কমতি বাড়তি, সুরের আরো নানা সহচরীরা। তখন থেকেই সুর হল তার মর্মসঙ্গিনী। দেবতার পূজায় এল সুর করে মন্ত্র বলা; শিকার করার সময় এল সুর মিলিয়ে আক্রমণ করার রীতি; ঝাড়ফুঁকে, ভূত-তাড়ানোয়, আনন্দের আয়োজনে, বিবাহে, জন্মে, মৃত্যুতে—সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে মানুষ সুরের রঙ লাগালো। প্রত্যূষে যখন সে শিকারে বেরিয়েছে তখন পাথরের অস্ত্র ঠুকে, চিৎকার করে, নিজের অলক্ষ্যে সুরের ঝোঁকে সে উন্মাদ্ হয়ে তাড়া করে বেড়িয়েছে বনের পশুকে। সন্ধ্যায় যখন সে নিহত পশুর রক্তে সর্বাঙ্গ লাল করে গুহায় ফিরে সপরিবারে ভোজের আয়োজন করেছে, তখনও পশুর ছাল ছাড়াতে ছাড়াতে সে গুণ গুণ করে সুর তুলেছে। রাত্রে আহারের পর গুহার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে স্ত্রীপুরুষ নৃত্য করেছে আনন্দে এবং সেই নৃত্যের তালে তালে ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠের সুর। মন্ত্র-ছড়া-গান-নাচ; পূজা-আচার-অনুষ্ঠান-আনন্দ—সমস্ত ভরে দিল মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার সুর॥

আজও তাই কর্মের মধ্যেও মানুষ চায় সুর, এমনকি যুদ্ধের নৃশংসতাতেও সে তুরী ভেরীর সুরঝঙ্কারকে রেখেছে সব আগে। হত্যার মত নির্মম কাজেও সে সুরকে এনেছে টেনে॥

সুর অসীম, কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়। সুরের সাহায্যে আমরা সৃষ্টি করি আবেগ—কখনও যন্ত্রণার, কখনও শান্তির, কখনও অভিমানের, কখনও প্রেমের। কিন্তু এই আবেগ প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে এমন একটা জিনিষ আনতে হয়, যাকে ভর করে আবেগ মুক্তি পেতে পারে। সেই জিনিষই বেগ, আবেগের ধর্ম। কথা যখন আবেগের সঙ্গে বেগ লাভ করে তখনই তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। আবেগের প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলেই এই বেগের বৈচিত্র্য। নির্জন শ্রাবণরাত্রি, আকাশে ঘনঘটা, রিম্‌ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, থেকে থেকে মেঘের গর্জন—এই

জিনিষটিকে সোজা সরল ভাষায় বলতে পারি। 'শ্রাবণের রাত, ঘন মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে, আর মেঘের গর্জন হচ্ছে'। এটা বাক্য হল—কিন্তু এতে আবেগ নাই। নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, কর্ম আর কর্তার সমাবেশ। হৃদয়ের অনুভূতির স্তর থেকে এগুলি আসেনি—একটা সংবাদ দেওয়া হয়েছে মাত্র। কিন্তু কবি যখন এই কটি সংবাদ-ধর্মী কথার মধ্যে সৃষ্টি করলেন আবেগ, হৃদয়ানুভূতির গভীরতম স্তর থেকে ছেঁকে আনলেন ধ্বনিময় সঙ্গীতময় সুরময় শব্দ—তখন তা আর নিছক সংবাদ থাকল না, হলো রসের সামগ্রী। তিনি যখন বললেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া-গরজন
রিম্‌ঝিম্‌ শবদে বরিষে।

তখন আমাদের সমস্ত হৃদয় জুড়ে অশ্রুবর্ষণ মুখর শ্রাবণের মেঘগর্জন এবং নিরন্তর বৃষ্টিধারার রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ অশান্ত সুরে বেজে চলতে লাগল। কথা শেষ হল, কিন্তু বলা শেষ হল না। কারণ কবি সমস্ত জিনিষটা একটি বেগের মধ্যে দুলিয়ে দিয়েছেন। একদিন বাইরের শ্রাবণ শেষ হয়ে মেঘগর্জন হবে স্তব্ধ, বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্‌ শব্দ হবে শান্ত—কিন্তু মনের মধ্যে যতবার এই কথা শুনব ততবারই শ্রাবণের ঘন মেঘ, মেঘের গর্জন এবং রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টির কান্না দুলে দুলে উঠবে ; তারা আর ছাপার অক্ষরে কথার বন্ধনে বাঁধা নাই, তারা পেয়েছে কথার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি এবং সেই মুক্তির বেগই মনে সৃষ্টি করেছে এমন এক দোলা যার আর শেষ নাই, থামা নাই॥

এই বেগই শব্দের বিন্যাস-বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করে আশ্চর্য এক সৌন্দর্য। শব্দের বিচিত্র বিন্যাসের সাহায্যে এই যে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি—এরই পদ্ধতিকে আমরা বলি ছ ন্দ র চ না। ছন্দ কথাকে বাইরের দিক থেকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে তাকে দেয় অন্তরে মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।······কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার

জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাকতে হিসাব করে বলা যায় না। সেইজন্যে কাব্য রচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে ॥

# ॥ ছন্দের লক্ষণ ও উপাদান ॥

কাব্য এবং গানের লক্ষ্য এক হলেও দুটির মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে। বিনা কথারও গান হতে পারে কেবল মাত্র সুরের বিশুদ্ধ মধুর আলাপে। বাঁশিতে যখন ভাটিয়ালী বাজানো হয় তখন তার মধ্যে কথা থাকে না, আমরাই সেই সুরের মধ্যে কল্পনায় কথা বসাই এবং সেই বিনা কথার গানের মধ্যে দিয়ে এমন একটা বেগের সৃষ্টি হয় যার দ্বারা আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়। —তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে নিতান্তই অহৈতুক আবেগ। "তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন বেগেই নিজেকে জানে, বাইরের সঙ্গে কোন ব্যবহারের যোগ নয়"। এক সুরের সঙ্গে আরেক সুর—নানা সুরের সমবায়ে একটা বেগের জন্ম হয়, তালের ওপর নির্ভর কোরে সেই বেগ একটা গতি লাভ করে। গানের দেবতা সুর, তাল তার বাহন ॥

কাব্যেরও উদ্দেশ্য আমাদের চেতনায় নাড়া দেওয়া, সেখানে আবেগের স্পন্দন সৃষ্টি করা। কিন্তু সুর যেমন বিনা কারণে উৎপন্ন হতে পারে কাব্য তা পারে না। সংসারের যে সমস্ত বিশেষ ঘটনাগুলি আমরা দেখি—জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, কলহ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ; ফুল ফোটা, মেঘ ওঠা, ঝরনা নেমে আসা ; রাত নির্জন হওয়া, তারার মিটমিট করা, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে যাওয়া—এ সবই সংসারের ঘটনা, কবির হাতে কাব্যে তার নতুন রূপান্তর হয় এবং সেই নতুন রূপান্তর আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে স্পন্দিত করে ॥

সুর কথা ছাড়াও চলতে পারে, কোন কোন সময়ে খুব স্পষ্টভাবে তালের বাহন ছাড়াও তার চলে। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কথা এবং কথার উদ্দেশ্য অর্থ জ্ঞাপন করা। সুরের মত কথা আপনি আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না। অর্থযুক্ত কথা বিচিত্র ধ্বনি ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে রসসৃষ্টি করতে পারলে তবেই আমরা তাকে কাব্য বলি। সেজন্য কাব্যের সংসারে পোষ্য অনেক। তার চাই প্রথমে ভাষা, ভাষা হওয়া চাই অর্থময়, ধ্বনিময়, ছন্দের বাহনে বেগময় ; এবং

ধ্বনি-অর্থ-ছন্দের সমবায়েই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলোনা—তাতে সৃষ্টি করতে হলে রস, কেননা রসাত্মকং বাক্যং ইতি কাব্যম্ ॥

কাব্যে ভাষা, ছন্দ এবং অর্থ বাইরের জিনিষ, রস ভিতরের। ভাষা অর্থ ছন্দ হচ্ছে সেতারের ঘাটের মত—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি সৃষ্টিই তার ধর্ম। ছন্দের বাঁধনে রসাত্মক বাক্য যখন মুক্তি পায় তখন হয় কাব্য। রস-মহাদেবের দুই ঘরণী ভাষা-রূপী পার্বতী এবং ছন্দময়ী গঙ্গা। একজন স্থির, গভীর ; অন্যজন চঞ্চল গতির বেগে উচ্ছল। পার্বতী এবং গঙ্গা নিয়েই শিব সম্পূর্ণ। ভাষা এবং ছন্দের বিচিত্র মিলনে রস-মহাদেবের সম্পূর্ণতা ॥

রসসৃষ্টিতে যেমন প্রয়োজন ভাষায় অলঙ্কার, রূপ, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতির সমাবেশের তেমনি প্রয়োজন এই সমস্তকে বয়ে নিয়ে যাবার বেগ, যা শব্দের বিন্যাস-বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি করে আশ্চর্য এক সৌন্দর্য। ছন্দ এই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রাণ। এবং প্রাণই যেহেতু আনন্দ, তেমনি ছন্দই কাব্যের আনন্দরূপী ব্রহ্ম ॥

কি করে বুঝব ছন্দ সৃষ্টি হল ? ছন্দের লক্ষণ কি ? পরিচয় কি ?

জিনিষটা এবার একটু খুঁটিয়ে আলোচনা করা হবে ॥

অ, ই, উ, ম্, ব্, ক্, খ্ ইত্যাদি পদের সবচেয়ে ছোট অংশকে আমরা বলি হরফ্ বা বর্ণ। বর্ণের শেষে স্বরযুক্ত হলে হয় অক্ষর। ক+আ=কা বর্ণ নয়, একে বলা হবে অক্ষর, ইংরেজিতে Syllable।

ডাক্তার ময়জন্
বাতাসে মেশায় কড়া পয়জন—

এই লাইন দুটির প্রথম শব্দ ডাক্তার-এর মধ্যে হরফ্ বা বর্ণ আছে—ড্+আ+ক্+ত্+আ+র্—মোট ছটি। কিন্তু অক্ষর আছে মাত্র দুটি ডাক্ আর তার্। তেমনি 'বাতাসে' শব্দের বর্ণ আছে ব+আ+ত্+আ+স্+এ—ছটি কিন্তু অক্ষর আছে দুটি 'বা' আর 'তাসে'। ডাক্, তার হলন্ত অক্ষর আর বা, তাসে স্বরান্ত অক্ষর। অ, আ, ই, উ, এ, ও—এগুলি মৌলিক স্বরধ্বনি। এদের ভাঙা যায় না। কিন্তু ঐ, ঔ এদের ভাঙা যায়, অ+ই=ঐ ; ও+উ=ঔ। এছাড়াও বাংলায় আরো কয়েকটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে। যেমন নাও শব্দের 'আও', নেই শব্দের 'এই'। বেড়ালের ডাকের ম্যাও-এর 'এ্যাও' ॥

আবার যে-সমস্ত অক্ষর উচ্চারণে কম সময় লাগে তাদের আমরা বলি হ্রস্বস্বর, বেশি সময় লাগলে দীর্ঘস্বর আর শব্দকে খুব টেনে—যেমন গানে, কান্নায়, দূর থেকে আহ্বান করার সময়—উচ্চারণ যে অতি দীর্ঘ করা হয় তাকে আমরা বলি প্লুতস্বর। বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের খুব একটা পার্থক্য করা হয় না, কিন্তু সংস্কৃতে এ-বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি। সেখানে হ্রস্বস্বরের মাত্রা এক, দীর্ঘস্বরের মাত্রা দুই। বাংলায় হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বর দুটোরই উচ্চারণের বেলায় মাত্রা এক ছন্দে গাঁথা, কবিতা পড়ার সময় কোথায় এক মাত্রা আর কোথায় দুই মাত্রা সেটা কানই ধরে দেয়॥

সংস্কৃত গ্রীক ইত্যাদি আর্যভাষায় এবং সেমিটিক আরবীতে অক্ষরের মাত্রার নড়চড় হবার উপায় নাই। বাংলাতে কোথায় দীর্ঘস্বর হবে তা নির্ভর করবে পাঠকের বলার ওপরে। আ, ঈ, ঊ সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর কিন্তু সাধারণত বাংলায় এগুলি হ্রস্ব, বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘ। 'দুঃখ আমার অসীম পাথার, পার হলো পার হলো' এখানে আমার, অসীম, পাথার, পার—এগুলিকে আমরা টেনে টেনে দীর্ঘ করে পড়ি না। কিন্তু

জনগণমন-অধিনায়ক জয়হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা

পড়ার সময় পড়ি 'না-আয়ক', 'ভা-আরত', 'ভা-আগ্য', 'বিধা-আ-তা-আ'। আ-কার কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ। কোথাও এক মাত্রা কোথাও বা দুই মাত্রা।

কথা বলার সময় মাঝে মাঝে নিশ্বাস আপনা আপনিই থেমে আসে, আবার নতুন করে নিশ্বাস নিয়ে বা দম নিয়ে আমরা পরবর্তী অংশ বলি। কথার অন্তর্নিহিত ভাবপ্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে আমাদের থামতেই হয়—এই বিরামকে বলে ছে দ। স্বল্পকালের বিরামকে বলে উ প চ্ছে দ ( minor breath pause ) আর দীর্ঘ বিরামকে বলে পূ র্ণ চ্ছে দ ( major breath pause )। গদ্যে শ্বাস বিরামের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই, বাক্য বা বাক্যাংশের অর্থ অনুযায়ী সেখানে শ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু পদ্যে তেমন নয়। সেখানে নির্দিষ্ট অক্ষরের পর ছন্দ রক্ষার অনুরোধে থামতেই হবে। একই লাইনে বা পঙক্তিতে সেখানে দুবার থামতে হতে পারে, তিনবার থামতে হতে পারে—যেমন ছন্দের হুকুম॥

এই থামা দুরকম। প্রথমে থামা ছন্দের হিসাবে, যা একমাত্র পদ্যেই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় থামা ভাব-প্রকাশের জন্যে, যা গদ্যে পদ্যে দুটোতেই আছে।

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙীন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে

এই চার লাইনের কবিতায় আমরা ছন্দরক্ষার খাতিরে আটবার থামছি—দূর সাগরের ১, পারের পবন ২, আসবে যখন ৩, কাছের কূলে ৪; রঙীন আগুন ৫, জ্বালবে ফাগুন ৬, মাতবে অশোক ৭, সোনার ফুলে ৮। আবার, 'কাছের কূলে' এবং 'সোনার ফুলে' বলার সময় 'দূরে সাগরের' বলার সময়ের চেয়ে একটু বেশি থামছি। 'দূর সাগরের' বলার সময়ে যে থামা সেটা উপচ্ছেদ; আর কাছের কূলে সোনার ফুলে বলার সময় পূর্ণচ্ছেদ।

এই থামা ছন্দের নিয়মে শাসিত॥ আর—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি?

পড়ার সময় ছন্দ বজায় রাখবার জন্য যদি থামতে হয়, তবে থামতে হবে এইভাবে—

সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর-চূড়ামণি ॥
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে ॥
অকালে কহ হে দেবি | অমৃতভাষিণি ॥
কোন বীরবরে বরি | সেনাপতি পদে ॥
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি ॥
রাঘবারি?

একটা দাঁড়িতে একবার অল্পক্ষণের জন্য থামছি, ডবল দাঁড়িতে একটু বেশি থামছি॥

কিন্তু অর্থপ্রকাশ করার জন্য, ভাব-প্রকাশের জন্য, যদি থামতে হয় তবে কবিতাটি পড়তে হবে এইভাবে –

সম্মুখ সমরে পড়ি |
বীর-চূড়ামণি বীরবাহু |
চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে ॥
কহ |
হে দেবি অমৃতভাষিণি ॥
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে ।
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি ॥

এখানেও এক দাঁড়িতে অল্প বিরাম, দুই দাঁড়িতে একটু বেশি। এই কবিতাটিতে যখন ছন্দের হিসাবে অল্প বা একটু বেশি বিরাম দেওয়া হবে, তখন তাকে বলা হবে য তি।

ভাবের হিসাবে যে বিরাম তাকে বলা হবে ছে দ। যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ছন্দ আর ছেদের দ্বারা বিকশিত হয় ভাব ॥

উপরে শ্রীমধুসূদন-রচিত যে কবিতাংশটি উধৃত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে--

সম্মুখ সমরে পড়ি | বীর-চূড়ামণি ॥

এই পঙক্তিটিতে যতি আছে দুটি, অক্ষর আছে—

৩ ৩ ২ | ৬ || =৮+৬=১৪টি

দ্বিতীয় পঙক্তি

বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে ॥
৪ ৪ | ২ ৪ || ৮+৬=১৪টি

তৃতীয়টিতেও

অকালে কহ হে দেবি | অমৃত-ভাষিণি ॥
৩ ৩ ২ ৩ ৩ ||=৮+৬=১৪টি

সবটিতেই ৮+৬=১৪ অক্ষরে একটা করে পূর্ণযতি, আর ৮ অক্ষর পরে একটি করে অর্ধযতি। সমগ্র ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য এই ছাঁদে লেখা।

এই ১৪টি অক্ষরকে এখন থেকে আমরা বলব মাত্রা। এই ছন্দটির নাম ১৪ মাত্রার ছন্দ।

এই ১৪ মাত্রার দুই ভাগ ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রা। আট মাত্রা পর্যন্ত অংশকে বলা হবে পর্ব। পরের ৬ মাত্রাও পর্ব। যতি এই পর্ব ভাগ করে দিয়েছে। তাহলে মাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক যতি থেকে আরেক যতি পর্যন্ত কবিভাষার অংশকে বলা হচ্ছে প র্ব ॥

পর্বের ভিতরকার শব্দগুলিকে বলে প র্বা ঙ্গ ॥

অবারিত ঃ মাঠ | গগন ঃ ললাট | চুমে ঃ তব ঃ পদ | ধূলি ॥

ছায়া ঃ সুনিবিড় | শান্তির ঃ নীড় | ছোট ঃ ছোট ঃ গ্রাম | গুলি ॥

এখানে এক দাঁড়িতে পর্ব, আর ঃ চিহ্নের দ্বারা পর্বাঙ্গ বোঝানো হল।

শেষ যতিতে অর্থাৎ ॥ চিহ্নে এসে ছন্দের চ র ণ বা ছত্র ( verse ) সম্পূর্ণ। কয়েকটি চরণ মিলে কবিতার ভাবের বা ভাবের অংশকে একটা পূর্ণ রূপ দেয়। তখন সেই চরণের সমষ্টিকে বলে স্ত ব ক ॥

বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির ॥

দুই চরণের স্তবক ॥

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভাল ক'রে জ্বলে।

কেউ ভুল করেনাকো—ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব

চুপ হ'য়ে ঘুমোবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে। —জীবনানন্দ দাশ।

তিন চরণের স্তবক ॥

সোনালী হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।

প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।

মুখর সে-গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।

হাল্‌কা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল ? —বিষ্ণু দে।

চার চরণের স্তবক ॥

তেমনি একটি আট চরণের স্তবক ঃ

অন্ন দাও, অন্ন দাও—
গলির মোড়ে কি জাগ্‌বে না ধানশিষ ?

জমানো সোনার রোদের সবুজ অন্ন
হাওয়ায় দোলানো আকাশে অন্ন
ভরানো মাটিতে লাগবে না ?
প্রাণের ক্ষুধায় অন্ন দাও।
রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে
অন্ন দাও। —অমিয় চক্রবর্তী

স্তবক রচনার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই। এক চরণেরও স্তবক হতে পারে, আবার বিশ চরণের স্তবক হতেও কোন বাধা নাই। একই কবিতায় অনেক স্তবক থাকতে পারে, আবার সেই স্তবকগুলিও বিভিন্ন চরণের সমষ্টিতে গঠিত হতে পারে। যেমন এই কবিতাটি ঃ

যন্ত্রণাজর্জর মুখ। বেদনায় বিক্ষত। বাঁ গালে
মস্ত একটা ক্ষতচিহ্ন। চিন্তার রেখায়
কুঞ্চিত কপাল। চক্ষু ছানি-পড়া। দু দণ্ড তাকালে
স্পষ্ট বোঝা যায়,
কোনো এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার
জিজ্ঞাসা নিহিত তার ওষ্ঠে, ভ্রূযুগলে।
'আবার হবে তো দেখা ? যেন হয়।' বলে
বিদায় নেবে সে এইবার।

দেখা হবে। অবশ্যই হবে।
যন্ত্রণা জর্জর মুখ, বেদনায় বিক্ষত, নীরবে
যে আসে, নীরবে চলে যায়,
মস্ত একটা ক্ষত যার বাঁ গালে ; চিন্তায়
কুঞ্চিত কপাল, চোখে ছানি,
সে আসবে সন্দেহ নেই। সে আসবে আবার, আমি জানি॥
—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

এই সুন্দর কবিতাটির স্তবক দুটি। প্রথম স্তবকে চরণ সংখ্যা আটটি। দ্বিতীয় স্তবকে চরণ ছটি॥

ইংরেজিতে যাকে বলে Accent তেমনি বাংলাতে বিশেষ করে কবিতায়, আমরা কতকগুলি পদ বেশ জোরের সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে উচ্চারণ করি। এই ধাক্কা বা ঠেস্ পড়ে পদের একটা মাত্র অক্ষরের ওপর। এই ধাক্কাকেই বলে স্ব রা ঘা ত বা শ্বা সা ঘা ত॥

ওই সিন্ধু´র টিপ্ সিং´হল দ্বীপ কাঞ্চ´ন ময় দেশ
ওই চন্দ´ন যার অঙ্গে´র বাস তাম্বু´ল বন কেশ

এখানে সিন্, সিং, কান্, চন্, অং, তাম্ এই পদগুলির ওপর ঝোঁক পড়ছে॥

এক চরণের শেষ শব্দের সঙ্গে পরের চরণের শেষ শব্দের ধ্বনির মিল থাকলে তাকে বলে অ ন্ত্যা নু প্রা স॥

চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্তবাহার
বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এখানে 'বাহার' আর 'তাহার'-এর ধ্বনির মিল। এই ধ্বনির মিল চরণে চরণে থাকতে পারে, যেমন উপরের কবিতায়। এক চরণ অন্তর অন্তরও হতে পারে—

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যাণ্ট গিয়েছিল ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে

—জীবনানন্দ দাশ।

এখানে দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে চতুর্থ চরণের মিল ; প্রথম তৃতীয়ে মিল নাই।

আবার—

যখন রবোনা আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
এসো তবে এসো এই নিভৃত ছায়ায়—
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

এখানে প্রথম-তৃতীয়ে এবং দ্বিতীয়-চতুর্থে মিল।

প্রথম চরণের সঙ্গে চতুর্থের, দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে তৃতীয় চরণের মিলের উদাহরণ ঃ

সন্ধ্যা তারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরঙ্গীর গোষ্ঠ হ'তে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে। —বিষ্ণু দে।

অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস আধুনিক বাঙালী কবিরা নানা বিচিত্র নিয়মে দিচ্ছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় তাতে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। এই বৈচিত্র্যের পথপ্রদর্শক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, উত্তরসাধক আধুনিক সমস্ত বাঙালী কবি। অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস, তা সে যত চরণ পরেই দেওয়া হোক না কেন—কবিতাকে করবে মি ত্রা ক্ষ র। উপরের সমস্ত কবিতাংশগুলি মিত্রাক্ষরের উদাহরণ॥

# ।। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ।।

বাংলা বাক্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের ইতিহাস একটা নাটকীয় ঘটনা। এই নাটকের নায়ক দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।

১৮৫৬ সালে বলতে গেলে একদম রিক্ত হস্তে কবি মধুসূদন মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরে আসার পরেই তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়ার নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন এবং সেখানে ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনীত হয়। নাটকটি লেখা হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। সে যুগের শৌখিন নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেলগাছিয়ার নাট্যশালা ছিল অগ্রণী। এর পরিচালক ছিলেন বেলগাছিয়ার রাজারা।

বেলগাছিয়ার নাট্যশালার সম্পর্কে মধুসূদন সেকালের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সঙ্গে পরিচিত হন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কবির সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার একজন গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হন। কাব্যানুরাগী যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে কবি মধুসূদনের কাব্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা হতো।

এই সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় কবি মধুসূদন কথায় কথায় মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনকে বলে ফেললেন, যতদিন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর প্রচলন না হবে, ততদিন বাংলা নাটকের কোন উন্নতি নাই। কবি তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' লেখার সময়েই বুঝতে পেরেছিলেন, ছন্দকে যদি পয়ারের মিত্রাক্ষর বন্ধন থেকে মুক্তি না দেওয়া হয় তবে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নাই।

কিন্তু যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তাঁর ধারণা বাংলা ভাষার তখন যে রকম অবস্থা তাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তিনি বাংলা ভাষার গঠন-বিশেষত্বের কথা বললেন, উন্নত ফরাসী ভাষায় অমিত্রাক্ষর লেখা হয়নি—সে কথাও বলতে ভুললেন না। ইংরাজি ভাষায় blank verse হয়েছে বলে সব ভাষাতেই 'ব্ল্যাঙ্ক ভার্স' হবে, তার কোন মানে নাই।

কিন্তু বিদ্রোহী মধুসূদন এই মত মেনে নিলেন না। তিনি বললেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা। সংস্কৃত যার জননী সেই ভাষার দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব। এই বলতে বলতেই তিনি হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—বাংলা ভাষার সাহায্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি কাব্য রচনা করে দেখিয়ে দেবেন যে তা সম্ভব।

মধুসূদন বাল্যকালেই কাশীরাম ও কৃত্তিবাস গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছিলেন—এর দ্বারা বাংলা ভাষার প্রবণতা ও সম্ভাবনা তিনি জানতেন। যৌবনে মিলটন, সেক্সপীয়র এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য কবিদের কাব্য থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের গঠন প্রণালীর মূল সূত্রটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সঙ্গীতে অনুরক্ত মধুসূদন শব্দের ধ্বনিমাধুর্যের গোপন রহস্যটির সঙ্গেও অপরিচিত ছিলেন না—সর্বোপরি ছিল তাঁর প্রতিভা এবং নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থা।

সুতরাং অমিত্রাক্ষর ছন্দেই মধুসূদন রচনা করলেন তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা-সম্ভব' এবং যতীন্দ্রমোহন ও অন্যান্য পণ্ডিত ও সাহিত্যানুরাগীদের একবাক্যে মধুসূদনের প্রতিভাকে স্বীকার করতে হল। বাজির সর্ত হিসাবে যতীন্দ্রমোহন 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য প্রকাশের সমস্ত ব্যয় বহন করলেন। কিন্তু কবির আসল পুরস্কার রাজনারায়ণ বসুর কথায়—your reward is very great indeed—immortality ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর রচনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যে গুপ্ত-যুগের অবসান ঘটল। এখানে গুপ্ত-যুগ অর্থ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পয়ারের যুগ। মধুসূদনের পূর্বে বাংলাকাব্য তিন চারটি ছন্দের বেশি বাহন জোগাড় করতে পারেনি—পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী—এই তিনটি ছন্দেই তখন বাংলা কাব্য রচিত হয়েছে। পয়ারে ১৪টি মাত্রা, ছত্রে ছত্রে অন্ত্যানুপ্রাস। প্রথম আট মাত্রার পরে অর্ধযতি, পরের ছয় মাত্রার পর পূর্ণযতি। এর আর কোন নড়চড় ছিল না ॥

মধুসূদন যে অমিত্রাক্ষর রচনা করলেন—তাতে মূল বন্ধনটি পয়ারের—প্রতি ছত্রেই সেখানে ১৪টি মাত্রা, প্রথম আট মাত্রায় অর্ধযতি, শেষ ছয় মাত্রায় পূর্ণযতি। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে এমন জিনিষ আছে যা পয়ারের আয়ত্তের বাইরে। তাঁর এই ছন্দে ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভার গাম্ভীর্যে ও ধ্বনিমাধুর্যে অনন্যসাধারণ, ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শ এবং সবচেয়ে বড় কথা ভাবপ্রকাশের জন্য ছেদচিহ্নের

( punctuation ) দক্ষ ও যোগ্য ব্যবহার। অমিত্রাক্ষরে অন্তমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস নাই। স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি, দীপ্তভাবের অনুগামী ছেদচিহ্ন এবং শব্দ ও ধ্বনিমাধুর্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর অননুকরণীয়। বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলেছেন ঃ

> মাইকেলের যতিস্থাপনের ( ছেদচিহ্ন স্থাপনের ) বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো যাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির উর্মিলতা।......যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো এ-কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো কারণে যদি না-ও হয়, শুধু বাংলা-ছন্দে প্রবহমানতার জনক বলেই মাইকেল উত্তর পুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়।

মধুসূদনের অনুসরণে নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা করেছেন। নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' অমিত্রাক্ষরে রচিত, কিন্তু মধুসূদনের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। পাশাপাশি তিন কবির তিন শ্রেষ্ঠ কাব্যের তিনটি অংশ তুলে দিলেই পাঠক কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারবেন।—

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে একটু উধৃতি ঃ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,<br>
পদ্মপর্ণে সুপ্তদেব পদ্মযোনি যেন,<br>
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,<br>
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা<br>
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।<br>
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি<br>
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বর লহরী<br>
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;<br>
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম সূর্যমুখী।

নবীনচন্দ্র সেনের অমিত্রাক্ষর

ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন ; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী।
অবসন্না শোকাতুর নির্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগৎ
নিশীথিনী-ছায়া-মত কৃষ্ণা ভয়ংকর,
মৃত্যু-ছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে ! কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে—শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত !

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমিত্রাক্ষর ঃ

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্য দেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য হরিশঙ্খ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পাসার বরষিল মুণীন্দ্রে আচ্ছাদি।
দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মত অমিত্রাক্ষর খুব বেশি রচনা করেননি। তাঁর ১৪ মাত্রার পয়ারের কবিতায় অন্তমিল আছে কিন্তু ছেদচিহ্ন ব্যবহার হয়েছে ভাবপ্রকাশের সহায়ক হিসাবে—

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন

রাজপথ পাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরাগঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখ-নিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

আবার ১৮ মাত্রার অন্তমিলহীন অমিত্রাক্ষরও তিনি রচনা করেছেন—

দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ ; পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয়ে দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।

বি-সম মাত্রার অন্তমিলহীন অমিত্রাক্ষরও রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি আশ্চর্য রূপ পেয়েছে ঃ

অভিভূত ধরণীর দীপ-নেভা তোরণদুয়ারে
আসে রাত্রি,
আধা অন্ধ আধা বোবা,
বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি
যুগারম্ভ সৃষ্টিশালে অসমাপ্তি পুঞ্জীভূত যেন
নিদ্রার মায়ায়।

মধুসূদনের অনুসরণে ১৪ মাত্রার অন্তমিলহীন অমিত্রাক্ষরও আধুনিক বহু কবি দক্ষতার সঙ্গে বাংলাকাব্যে প্রয়োগ করেছেন। একটি উদাহরণ ঃ

আমার সোনার ধানে
পরিচিত হাত রাখে শত্রুর দালাল।
দিগন্তে ধূসর মাঠে গতপত্র বট
মাথা নাড়ে প্রবীণ ক্লান্তিতে। সে কি জানে
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালী
দিনগত পাপক্ষয়ে মূঢ় ভ্রান্তমতি
লোকায়ত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন বিধুর
মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি? —সমর সেন।

রবীন্দ্রনাথের ১৮ মাত্রার অমিত্রাক্ষর অনুসরণে রচনা ঃ

ভেলা
আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও
লক্ষ্য ভেদী নিষাদের উল্বণ উল্লাস উদাসীন
নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মাল্লাদের
গুণটানা থেকে। —সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

মধুসূদন বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষরের জনক। তাঁর সৃষ্টিও গতানুগতিকতার বাঁধা রাস্তায় চলেনি। রবীন্দ্রনাথ তাকে আরেকটি নূতন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বিশালতর সম্ভাবনার দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। আজও রবীন্দ্রপরবর্তী শক্তিশালী কবিদের অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নাই॥

## ।। গদ্য ছন্দ ।।

গদ্য ছন্দ কথাটি হঠাৎ শুনলে মনে হয় যেন সোনার পাথরবাটি। গদ্য কথার আবার ছন্দ কি? গদ্য দিয়ে কি কবিতা হতে পারে? কথাকে ছন্দের নিগড়ে বাঁধলে তবেই পদ্যসৃষ্টি হয়। গদ্যকে ত ছন্দে বাঁধা যায় না তবে গদ্যে কবিতা কি করে হবে? যাঁরা গদ্য-কবিতা বা গদ্য-ছন্দে রচিত কবিতা পছন্দ করেন না, তাঁদের প্রধান আপত্তি উপরে দেওয়া হল।

কিন্তু গদ্যে কবিতা রচনা হয়েছে। বাইবেল মূলে রচনা হয়েছিল পদ্যে কিন্তু ইংলণ্ডে রেনেশাঁ আমলে প্রথম যে বাইবেলের প্রামাণ্য ইংরেজি অনুবাদ হল তা গদ্যে। কিন্তু verse হিসাবে সেই গদ্যকে মেনে নিতে কোথাও আপত্তি ওঠেনি। আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যান যখন লিখলেন—

> Of life immense in passion, pulse and power
> Cheerful for the freest action
> formed under the laws divine,
> —The Modern Man I sing.

তখন তাকে কবিতা বলে আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজি অনুবাদ গদ্যে কিন্তু তাকে য়ুরোপের কাব্যরসিক সমাজ পদ্য বলে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তবে বাংলা ভাষাতেই বা গদ্যের ছাঁদে কবিতা রচনা চলবে না কেন?

অমিত্রাক্ষর রচনা করে মধুসূদন পয়ারের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আর প্রচলিত সমস্ত রকমের ছন্দের বন্ধন থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষায় গদ্যের চালে কবিতা রচনার সমস্ত গৌরব রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য এবং বোধহয় বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, এই পর্যায়ে তাঁকে অতিক্রম করে যাওয়ার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী কবি দেখাতে পারেননি॥

রবীন্দ্রনাথই যখন বাংলা কাব্যে গদ্যছন্দের প্রবর্তক তখন তাঁর মুখ থেকেই শুনি গদ্যছন্দ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন ঃ

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। সেই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মত বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।......পরীক্ষা করেছি, লিপিকার অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে।......গদ্য কাব্যে অতি-নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্য-কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। ২ আশ্বিন ১৩৩৯ ॥

কবিগুরু 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থকে প্রথম বাংলা গদ্য কবিতার নমুনা হিসাবে দাখিল করলেও এর সূচনা দেখা গিয়েছিল 'লিপিকা'র রচনাগুলিতে। তবে ছত্রগুলি সেখানে কবিতার ছত্রের মত সাজানো ছিল না। কিন্তু 'লিপিকা'র কবিতাকে পদ্যে সাজালেও কোন ইতর বিশেষ হয় না। 'পুনশ্চ' প্রসঙ্গে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গদ্য কবিতা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আরো এক জায়গায় বলছেন—

যখন কবিতাগুলি পড়বে তখন পূর্বাভ্যাস-মতো মনে কোরনা ওগুলো পদ্য। অনেকে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে রুষ্ট হয়ে ওঠে। গদ্যের প্রতি পদ্যের সম্মান রক্ষা করে চলা উচিৎ। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মত ব্যবহার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়—এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী পাতাগুলিতে। ২৬ আশ্বিন ১৩৩৯ ॥

—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত আরেকটি চিঠি—

গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। এই নাচের গতির প্রত্যেক অংশের মধ্যে সুসংগতি থাকা চাই ; যদি কোন গতির মধ্যে নাচের

ধরণটা থাকে অথচ সুসংগতি না থাকে তবে সেটা চলাও হবে না, নাচও হবে না, হবে খোঁড়ার চাল অথবা লম্ফঝম্প। কোনো ছন্দে বাঁধন বেশি, কোনো ছন্দে বাঁধন কম; তবু ছন্দমাত্রের অন্তরে একটা ওজন আছে সেটার অভাব ঘটলে যে টলমলে ব্যাপার দাঁড়ায় তাকে বলা যেতে পারে মাতালের চাল, তাতে সুবিধাও নেই, সৌন্দর্যও নেই। ২২ জুলাই ১৯৩২ ॥

একই ব্যক্তিকে ২৮ আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখে লেখা আরেকখানি চিঠি—

গদ্যকে গদ্য বলে স্বীকার করেও তাকে কাব্যের পঙক্তিতে বসিয়ে দিলে আচার বিরুদ্ধ হলেও সুবিচার বিরুদ্ধ না হতেও পারে যদি তাতে কবিত্ব থাকে। ইদানীং দেখছি গদ্য আর রাশ মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝাবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে--এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাইনে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে ॥

এই সমস্ত উধৃতিগুলির থেকে যে জিনিষটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তা হচ্ছে এই যে পদ্যছন্দে ভাবপ্রকাশ করার ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, 'তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথভাবে মেনে চলে বলেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ প্রসাধন, আয়োজন বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে'। কিন্তু এই ছন্দের বাঁধন যদি খুলে দেওয়া হয়, সরিয়ে দেওয়া হয় তার প্রসাধন তবে ভাব প্রকাশে খুব অসুবিধা কি ঘটবে ॥

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। একজন লাবণ্যময়ী রমণীর বাইরের প্রসাধন এবং অলঙ্কার সহযোগে নৃত্য নিশ্চয় সুন্দর এবং বিশিষ্ট। কিন্তু যদি তার প্রসাধন

সরিয়ে নেওয়া হয় তবে তার লাবণ্যের কি কোন ক্ষতি হবে। লাবণ্যময়ী রমণীর দেহভঙ্গী যদি সুন্দর হয় তবে নৃত্য করলেও তাকে সুন্দর দেখাবে, হাঁটলেও সুন্দর লাগবে। আসল জিনিষটা হচ্ছে সৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্য যদি স্বাভাবিকভাবে তার সর্বাঙ্গে থাকে তবে প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন হলেও রসের আবেদন সৃষ্টিতে ইতরবিশেষ হয় না। হরিণের দৌড়ে যাওয়া সুন্দর এবং মধুর ; তাতে আছে একটি বিশেষ ছন্দ। কিন্তু শিকারের পিছনে তাড়া-করে-যাওয়া চিতাবাঘের দৌড়ানোও কি সুন্দর নয়। তার সেই বলিষ্ঠ দেহভঙ্গীর দৃঢ় প্রকাশের মধ্যে একটা আলাদা চাল আছে, যা আমাদের চোখ এবং মনকে তৃপ্ত করে। উদয়শঙ্করের দেহের গড়ন সুন্দর বলেই রঙ্গমঞ্চে তিনি যখন নৃত্য করেন তাঁকে দেখে সুন্দর লাগে, আবার রঙ্গমঞ্চের বাইরে তিনি যখন হেঁটে যান তখনও তিনি সুন্দর। প্রথমটা লালিত্যে সুন্দর, দ্বিতীয়টা পৌরুষের আবেদন দৃষ্টিতে সুন্দর।।

সুতরাং এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, বক্তব্য বিষয় যদি সুন্দর হয়, যদি তাতে থাকে কাব্যের উপাদান তবে তাকে ছন্দের নূপুর পরিয়ে নাচিয়ে দিলেও সুন্দর লাগবে, গদ্যের রাজপথে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেও কম খারাপ লাগবে না। কিন্তু আসল কথা এবং বারবার মনে রাখবার মত কথা হচ্ছে এই যে, 'এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছাল না এটা শোচনীয়। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভ নিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্য কাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন'।

রসাত্মক বাক্যই হচ্ছে কাব্য। সেটা যদি পদ্যে বলি তবে তা হবে পদ্যকাব্য, গদ্যে বললে হবে গদ্য কাব্য। পদ্যে লিখলেই কবিতা ভালো হবে আর গদ্যে লিখলে সেটা রসিক সমাজের পাতে দেওয়া চলবে না এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের পদ্যে লেখা একটি কবিতা এবং তারই গদ্যে রূপান্তর এখানে পরপর তুলে দিচ্ছি শুধু এইটা প্রমাণ করবার জন্যে যে কাব্য রচনায় বাহনটাই বড় জিনিষ নয়, ভাবটিই বড়। প্রথমটি পদ্যছন্দে—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।

সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকট দর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসায় উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণা নিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।
তূরী ভেরী বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরো থরো ।।

[ বুদ্ধভক্তি ঃ নবজাতক ]

এবার এর গদ্যের রূপ ঃ

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হলো বাঁকা, চোখ হলো রাঙা
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়,
বেজে উঠল তূরী ভেরী গরগর শব্দে
কেঁপে উঠল পৃথিবী ।।

জাপানীদের চীন আক্রমণ করার সময় বুদ্ধভক্তির স্বরূপ দেখানোই উদ্দেশ্য। সেই বুদ্ধভক্তির প্রতি নির্মম বিদ্রূপ পদ্যেও যেমন শাণিত, গদ্যেও তেমনি ধারালো ।।

নেই-নেই করলেও, গদ্য কাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> আন্তরিক প্রবর্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ ( অর্থাৎ গদ্যের আবাঁধা ছন্দ ) চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তার ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভার-সামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো-ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়।……

সে জন্যই যখন আমরা পড়ি—

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝা বাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তরের কবি ;
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে ;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী ॥

তখন আমাদের অজ্ঞাতে সেখানে যতিসৃষ্টি হয় এইভাবে—

আজ যখন | পশ্চিম দিগন্তে |
প্রদোষকাল | ঝঞ্ঝাবাতাসে | রুদ্ধশ্বাস ॥
যখন | গুপ্ত গহ্বর থেকে | পশুরা বেরিয়ে এল ॥
অশুভ ধ্বনিতে | ঘোষণা করল | দিনের অন্তিমকাল ॥
এসো | যুগান্তের কবি ॥
আসন্ন সন্ধ্যার | শেষ রশ্মিপাতে |
দাঁড়াও | ওই মানহারা | মানবীর দ্বারে ॥
বলো | ক্ষমা করো ॥
হিংস্র প্রলাপের | মধ্যে |
সেই হোক | তোমার সভ্যতার | শেষ পুণ্যবাণী ॥

সুগভীর ভাব এবং কুশল শব্দচয়ন গদ্যকাব্যের প্রাণ। আধুনিক কালে গদ্য-কবিতা যেসব খ্যাতনামা কবিরা রচনা করেছেন, তাঁরা এখনও রবীন্দ্রনাথের মত পরিপূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। সেই জন্যেই মনে হয়, পদ্যকাব্যের চেয়ে সুষ্ঠু গদ্যকাব্য রচনা বেশি কঠিন ॥

# ।। ভারতীয় ছন্দের ক্রমবিবর্তন ।।

মানুষ যেদিন থেকে গান এবং মন্ত্রের দ্বারা নিজের অবসরের আনন্দকে উপভোগ এবং দৈবশক্তির বন্দনা রচনা করেছে সেদিন থেকেই ভাষায় ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষ যেখানে হয়েছে সব আগে, সেখানেই এর উপস্থিতি হয়েছে সর্বাগ্রে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির যে নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে দেবদেবীর বন্দনাগীতিমূলক সাহিত্যের মাধ্যমে সেই দেশে তৎকালে প্রচলিত ছন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে ॥

আজকাল পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলির ইতিহাস আলোচনা করে পণ্ডিতরা তাদের বিভিন্ন বর্গে ভাগ করেছেন। এই বর্গ নিরূপণ হয়েছে এই সূত্র অনুসরণ করে—(ক) একই পর্যায়ের বা বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে শব্দকোষে এবং ব্যাকরণে লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য থাকবে এবং (খ) দুই বা ততোধিক ভাষার পূর্বতন রূপ একই রকমের হবে। এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহের সুযোগ না থাকে, তবে সেই ভাষাগুলির মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক থাকতে বাধ্য ॥

এই সূত্র অনুযায়ী প্রাচীন পারসিক, আবেস্তীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন লাটিন, সংস্কৃত, প্রাচীন কেলটিক, প্রাচীন জার্মানিক—সমস্তই একটা বিশেষ ভাষাবর্গের বিভিন্ন শাখা। এই বর্গের নাম—ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাবর্গ (Indo-European Languages)। মধ্য এশিয়া, য়ুরোপ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলের আর্যরা অতি প্রাচীনকালে একই ভাষাবর্গের অধীন ছিলেন ॥

আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে আর্যরা ভারতে আসেন এবং উত্তর ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এঁরা এসেছিলেন ছোট ছোট দলে, কথ্যভাষায় এক দলের সঙ্গে অন্য দলের একটু আধটু স্বাতন্ত্র্য ছিল কিন্তু ভাষার দিক দিয়ে মোটামুটি ঐক্যের অভাব ছিল না। এঁদের শক্তিশালী ভাষা এবং উচ্চ শ্রেণীর দেবগীতিমূলক সাহিত্য তাঁদের সংস্কৃতির দীনতাকে ঢেকে দিয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঋক্‌বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির রচনা আর সেগুলির সংকলন হয় আনুমানিক ১১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। আদি ভারতীয়-আর্যভাষার প্রাচীন স্তরটি বৈদিক সাহিত্য নিয়েই গঠিত ॥

।। বৈদিক ছন্দ ।।

আদি ভারতীয়-আর্য (Old Indo-Aryan) ভাষায় ছন্দের রীতি ছিল অক্ষর মাত্রিক, অক্ষরের বা syllable-এর নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর ছন্দের রূপ নির্ভরশীল ছিল। অক্ষরের গুরুলঘু নির্দিষ্ট রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুলঘু ক্রমের স্বাধীনতাও ছিল। বৈদিক ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস বা অন্তমিল ছিল না।

বৈদিক ছন্দ মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত—ত্রিষ্টুভ, গায়ত্রী, জগতী, অনুষ্টুভ্ ও বিরাজ।

ত্রিষ্টুভ ৭+৪ অক্ষরের সমবায়ে ১১ অক্ষরের চারটি পাদে গঠিত। সাত অক্ষরের পরে যতি।

ওজায়মানো অবৃ- | নীত সোমং
ত্রিকদ্রুকেষু অপি- | বৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবা- | দত্ত বজ্রং
অহন্নহিং প্রথম- | জাম্ অহীনাম্ ॥*

গা য় ত্রী ছন্দে আটটি অক্ষর, পাদ তিনটি ; চতুর্থ অক্ষরের পর যতি।

তম্ অমবন্তম্ | যজতম্।
সূরস্ ধামসু | শবিষ্ঠম্।
মিত্রং যজৈ | হোত্রাভ্যঃ ॥

এর সঙ্গে আবেস্তার একটি শ্লোক তুলনীয়—

তম অমবন্তম্ যজতম্।
সূরম্ দামোহু সবিশ্‌তম্।
মিথ্রম্ যজই জওথ্রাবো ॥

জ গ তী ছন্দে বারো অক্ষর, সাত অক্ষরের পর যতি।

অক্ষাস্ ইদঙ্কুশি- | নো নিতোদিনো ॥
নিকৃত্বানস্তপনাস্- | তাপয়িষ্ণবঃ ॥
কুমারদেষ্ণা জয়- | তঃ পুণর্হণো ॥
মধ্বা সম্পৃক্তাঃ কিত—বস্য বর্হণা ॥ *

---

* ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সংগৃহীত।

অ নু ষ্টু ভ্ ছন্দে চারিটি পাদ, প্রতি পাদে আট অক্ষর, চতুর্থ অক্ষরের পর যতি।

সংবৎসরং | শশায়ানা ॥
ব্রাহ্মণা ব্র- | ত চারিণঃ ॥
বাচং পর্জ- | ন্য জিন্বিতাং ॥
প্র মণ্ডুকা | অবাদিষুঃ ॥*

বিরাজ ছন্দে দশটি অক্ষর, পঞ্চম অক্ষরের পরে যতি ; দুই পাদে শ্লোক সমাপ্ত।।

**॥ সংস্কৃত ছন্দ ॥**

সংস্কৃতের প্রধান ছন্দ অনুষ্টুভ্। অন্যান্য ছন্দও সংস্কৃতে আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী, মালিনী, পঞ্চচামর, তোটক, পজ্ঝটিকা ইত্যাদি। এই ছন্দগুলি বাংলাতে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ রূপান্তরিত করেছেন। সংস্কৃত অ নু ষ্টু ভে র বাংলা রূপান্তর ঃ

পাঁচালী নাম বিখ্যাতা | সাধারণ মনোরমা ॥
পয়ার ত্রিপদী আদি | প্রাকৃতে হয় চালনা ॥
দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ | তুল্য সংখ্যার অক্ষরে ॥
পাঠে দুই পদে মাত্র | শেষাক্ষর সদা মিলে ॥

—ভুবনমোহন রায়চৌধুরী কৃত রূপান্তর।

সংস্কৃত কাব্যে কালিদাস রচিত ম ন্দা ক্রা ন্তা য় চারটি পর্ব—প্রতি পর্বে যথাক্রমে আট, সাত, সাত এবং চার মাত্রা।

কশ্চিৎকান্তা | বিরহ গুরুণা | স্বাধিকার | প্রমত্তঃ ॥
শাপেনস্তং | গমিতমহিমা | বর্ষভোগেন | ভর্তুঃ ॥

বাংলা উদাহরণ ঃ

দেখহ সুন্দর | লৌহরথে চড়ি | লৌহ পথে কত | লোক চলে।
ষষ্ঠ মুহূর্তক | মধ্যে করে গতি | যোজন পঞ্চদ | -শের পথে ॥

—ভুবনমোহন রায়চৌধুরী ॥

* ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সংগৃহীত।

বলা বাহুল্য রেলগাড়ীর গুণবর্ণনা এতে আছে, কিন্তু কাব্যরস নাই। রবীন্দ্রনাথের মন্দাক্রান্তার একটু উদাহরণ প্রসঙ্গত এখানে উধৃত করিঃ

| | |
|---|---|
| সারা প্রভাতের বাণী | বিকালে গেঁথে আনি |
| ভাবিনু হার খানি | দিব গলে ॥ |
| ভয়ে ভয়ে অবশেষে | তোমার কাছে এসে |
| কথা যে যায় ভেসে | আঁখি জলে ॥ |
| দিন যবে হয় গত | না-বলা কথা যত |
| খেলার ভেলা মতো | হেলাভরে ॥ |
| লীলা তার করে সারা | যে-পথে ঠাঁই হারা |
| রাতের যত তারা | যায় সরে ॥ |

মন্দাক্রান্তার মাত্রা অনুযায়ী প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পর্বে ৭ মাত্রা, তৃতীয় পর্বে ৭ মাত্রা এবং চতুর্থ পর্বে চারমাত্রা ঠিক গুণে গুণে বসানো, এবং সমগ্র কবিতাটিতে একটি আশ্চর্য রসপ্রবাহ প্রবাহিত।

সংস্কৃত শি খ রি ণী ছন্দের বাংলা রূপান্তর—

বিলাতে পালাতে ছট্‌ফট্ করে নব্য গৌড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয়না
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধৃতি পির্‌হনে মান রয়না।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প জ্ ঝ টি কা ঃ

পুরহর কৈটভ মর্দন শৌরে।
গিরিশ খগাধিপ সুন্দরধোরে ॥
শঙ্কর মুরহর কুরুভবপাররম্।
হে হরি হর হর দুষ্কৃতভারম্ ॥

বাংলা উদাহরণ ঃ

নূপুর কঙ্কণ কিঙ্কিনী বোলে
মণিময় মণ্ডল কুণ্ডল দোলে ॥

নাগর ঝাঁপই কাঁপই বালা।

দোজন সোঁসর সরম করালা॥ —মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

সংস্কৃত তো ট ক ছন্দের বাংলা উদাহরণ ঃ

রণপণ্ডিত খণ্ডিত বৈরী শিরে।

পরিলা যতনে গলহার ক'রে॥

সমরে বিহরে রিপুদন্তী হরে।

রণসিংহ ইথে নৃপ নাম ধরে॥ —ভারতচন্দ্র।

সংস্কৃত মা লি নী ছন্দের বাংলা রূপান্তর ঃ

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল

শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর;

ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন,

যৌবনের জীর্ণ-নির্ভর। —সত্যেন্দ্রনাথ।

প ঞ্চ চা ম র ছন্দ ঃ

মহৎ ভয়ের মূরত্‌ সাগর

বরণ তোমার তমঃশ্যামল।

মহেশ্বরের প্রলয় পিনাক

শোনাও আমায় শোনাও কেবল॥

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

## ॥ পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ছন্দ ॥

পালি ভাষায় রচিত কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ সংস্কৃতেরই মত। এই ছন্দ প্রধানতঃ অক্ষরমূলক, কখনও-বা মাত্রামূলক। পালিতে ব্যবহৃত কয়েকটি ছন্দের উদাহরণ ঃ

উত্তমংগরুহা মজ্‌ঝং | ইমে জাতা বয়োহরা॥

পাতুভূতা দেবদূতা | পব্‌বজ্জাসময়ো মমাতি॥

[ মখাদেব জাতক থেকে ]

পতিগচ্ছ এব তং কয়িরা | ইয়ং জঞ্‌ঞা হিতং অত্তনো॥

ন সাকত্তিক চিন্তায়- | মন্তা ধীরো পরাক্কমে॥

[ মিলিন্দ্‌ পহ্নো থেকে ]

সর্বভিভূ সর্ববিদ্ | হং অস্মি ॥
সর্বেষু ধর্মেষু | অনোপলিপ্ত ॥
সর্বং জহে তৃষ্ণ- | কস্য বিমুক্তো ॥
ন মাদৃসো সংপ্রজ- | নেতি বেদনা ॥

[ বৌদ্ধ-সংস্কৃত থেকে ]

প্রা কৃ তে বিশিষ্ট ছন্দ গাহা ( বা গাথা )। উদাহরণ ঃ

কোই অব রহিঅং পেম্ম ণহি হোই | মামি মানুষে লোএ ॥
জই হোই ণ তিস্‌স বিরহো বিরহে | হোন্তম্মি কে জীঅই ॥

কালিদাসের কাব্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতের আরেক রকম ছন্দ ঃ

মঈং জাণিঅ | মিঅ-লোঅণি।
ণিসঅরু কোই হরেই ॥
জাব ণু নভ- | তলি সামল।
ধারাহরু বরিসেই ॥ [ বিক্রমোর্বশী থেকে ]

পরহুঅ | মহুর প | লাবিণি | কন্তি—
ণন্দণ | বণ স—চ্ছন্দ ভ- | মন্তি—
জই তুএ্রী | পিঅঅম | সা মহু | দিট্‌ঠী—
তা আ- | অক্‌খহি | মহু পর- | পুট্‌ঠী— [ বিক্রমোর্বশী থেকে ]

অরিহসি মে চুঅংকুর দিণ্ণো | কামাস্‌স গহিঅ চাবস্‌স ॥
সত্তবিঅ জুঅই লক্‌খো পঞ্চব্‌ | —ভহিঅ সরো হোউং ॥

[ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ থেকে ]

অ প ভ্র ং শ ভাষায় আমরা নানা বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার দেখছি। বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্যও অনেকাংশে অপভ্রংশের দ্বারা প্রভাবিত।

অরেরে বাহই কাহ্নু ণাব ছোড়ি    ডগমগ কুগতি ণ দেহি
তই ইথি ণইহি সন্তার দেই    জো চাহসি সো লেহি ॥

[ প্রাকৃতপৈঙ্গল থেকে ]

প্রাকৃত পৈঙ্গলে সঙ্কলিত শ্লোকগুলি থেকে আরো কয়েকটি ছন্দ-বৈচিত্র্যের উদাহরণ দিই :

জস্স সিসই গংগা গোরি অধংগা
গিম পহিরই ফণিহারা।
কণ্ঠট্‌ঠিঅ বিসা পিন্ধণ দিসা
সংতারই সংসারা॥

*

সের এক্ক জই | পাবহি ঘিত্তা।
মণ্ডা বিসা | পকাইল ণিত্তা॥
টংকা এক্কু জই | সিন্ধব পাআ।
সো হউ রংক | সো ইহ রাআ॥

*

সহস মদমত্ত গঅ লাখ লাখ পক্খরিঅ
সাহি দুই সাজি খেলত গিন্দূ।
কোপ্পি পিঅ জাহি তহি থপ্পু জসু বিমল মহি
জিণই ণহি কোই তুঅ তুলক হিন্দু॥

*

সো মঝু কন্তা
দূর দিগন্তা
পাউস আএ
চেলু দুলাএ॥

*

তরল-কমল-দল— | সরি-জুঅ ণঅণা॥
সরঅ-সমঅ-সসি | সুঅরিস-বঅনা॥
মঅগল-করিবর | সঅলস গমণী॥
কমণা সুকিঅ-ফল | বিহি গড়ু রমণী॥*

---

* পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ছন্দের নমুনা হিসাবে উধৃত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ লেখকের **'মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য'**-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য॥

## ॥ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ ॥

চর্যাপদকেই আমরা বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরে থাকি। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় চর্যাপদ যেমন অপরিহার্য, বাংলা গীতিকবিতার উৎস নির্ণয়েও চর্যাপদের স্থান তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটা দিকে চর্যাপদগুলি বাংলা পদাবলী-সাহিত্যের আদর্শ-স্থানীয়। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর সবচেয়ে পুরোনো রূপের নিদর্শন আমরা এই সমস্ত চর্যাতেই পেতে পারি। চর্যাপদে ব্যবহৃত কয়েকটি ছন্দের উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

ডোম্বী বিবাহিআ | অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ | আণুতু ধাম ॥
অহনিশি সুরঅ- | পসঙ্গে জাঅ।
জোইনি জালে | রঅণি পোহাঅ ॥ চর্যা ঃ ১৯।

এখানে পাঠককে মনে রাখতে হবে সেই সময় স্বরধ্বনির উচ্চারণ পুরো একমাত্রা ছিল না বলে পয়ার ছত্রে চোদ্দ অক্ষরের কমও দেখা যায়। দীর্ঘপয়ার ঃ

নানা তরুবর | মোউলিল রে | গঅণত | লাগেলী ডালী।
একেলা সবরী | এবণ হিণ্ডই | কর্ণকুণ্ডল- | বজ্র ধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট | পাড়িলা সবরো | মহাসুহে | সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ | নৈরামণি দারী | পেহ্মরাতি | পোহাইলী ॥
—চর্যা ২৮।

এই ছন্দকে ত্রিপদীতেও সাজানো যায় ঃ

নানা তরুবর মোউলিল রে
গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলা সবরী এ বন হিণ্ডই
কর্ণকুণ্ডল-বজ্র ধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো
মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী
পেহ্মরাতি পোহাইলী ॥

চর্যাপদের সমস্ত চর্যাতেই অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত। তবে 'ডালী'র সঙ্গে 'ধারী' এইরকম অস্বাভাবিক মিল সেখানে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাবে। বাংলাভাষার তৎকালীন অবস্থা স্মরণ করে আমরা এই দোষগুলি উপেক্ষা করতে পারি। চর্যা-পদের কবি সিদ্ধাচার্যরা সবাই সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করে আচার্যরা বৃত্তছন্দেই চর্যাগুলি রচনা করতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই প্রেরণার পিছনে অপভ্রংশের প্রভাব কিছু কম ছিল না। এই সিদ্ধাচার্যদের চর্যাপদের মাধ্যমেই বাংলা ছন্দের নিজস্বতার মূল ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে। বাংলা কবিতার জনক হিসাবে সিদ্ধাচার্যদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব। শুধু তাই নয়, সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যা অনুযায়ী বাংলা ছন্দের নামকরণও তাঁরা করেছেন। যেমন 'দশাক্ষরা'—

সুনে সুন মিলিআ জবেঁ।
সঅলধাম উইআ তবেঁ॥
আচ্ছহুঁ চউখণ সংবোহী।
মাঝ নিরোহেঁ অণুঅর বোহী॥
বিন্দুণাদ ণ হিএঁ পইঠা।
আণ চাহন্তে আণ বিণঠা॥ —চর্যা ৪৪।

৪৯নং চর্যাতেও এই ধরণের ছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম গণনায় চর্যাতে ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ মাত্রার ছন্দ। অক্ষর সমতা একই চর্যার বিভিন্ন পঙক্তির মধ্যে সর্বত্র নাই। কিন্তু যে-পরীক্ষা এঁরা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাকেই অবলম্বন করে বাংলা ছন্দের একাবলী, পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদির ভিত্তি গঠিত হয়ে যায়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্‌' কাব্যেও চর্যাপদের ছন্দের প্রভাব দেখা যায়।

ধীর সমীরে | যমুনাতীরে | বসতি বনে বন- | মালী।
পীন পয়োধর | পরিসর মর্দন | চঞ্চল-কর যুগ- | শালী॥

এর সঙ্গে তুলনীয় চর্যাপদের—

কিন্তো মন্তে | কিন্তো তন্তে | কিন্তোরে ঝাণব- | খানে।
অপইঠান- | মহাসুহলীলেঁ | দুলকৃখ পরমনি | বাণে॥

—চর্যা ৩৪।

চৌদ্দ পঙক্তিতে সম্পূর্ণ চতুর্দশপদাবলীর ভারতীয় সংস্করণও চর্যাপদের চর্যাগীতিতে অনুপস্থিত নয়। মধুসূদন সর্বপ্রথম বাংলা সনেট রচয়িতা হিসাবে সম্মানিত তিনি সনেটের বাংলা নাম দিয়েছেন চতুর্দশপদী। সে জিনিষ মহাকবি সেক্সপীয়রও মিলটনের অনুকরণে মধুসূদন বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। ইংরেজি সনেটও আবার ইতালীর সনেটের অনুকরণে সেই সাহিত্যে আমদানী হয়েছিল। মধুসূদনের জন্য আজ সনেট ও চতুর্দশপদী সমার্থক হয়ে গিয়েছে—চতুর্দশপদী শুনলেই আমরা সনেট বলে মনে করি এবং তার মধ্যে সনেটের বিশেষ গুণ ও রীতিগুলি অনুসন্ধান করি। এই টেক্‌নিক্যাল দিকটা মনে না রেখে, চৌদ্দ পঙক্তির বা চরণের কবিতা মাত্রকেই যদি আমরা চতুর্দশপদী কবিতা বলে মেনে নিতে মনকে উদার করি, তবে বাঙালী কবিরা চর্যাপদেই প্রথম চৌদ্দ পঙক্তির কবিতা রচনা করেছেন এই ভেবে আমরা নিশ্চয় গর্ববোধ করতে পারি। এই রকম একটি কবিতা উদ্ধৃত করি—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ ।।
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ ।।
এক সো পাদ্মা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ।।
হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ ।।
তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া ।।
তু লো ডোম্বী হাঁউ-কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী ।।
সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ ।। —চর্যা ১০।

৫০ নং চর্যায়ও চতুর্দশ পঙক্তিতে একটি ভাবের বিকাশ। চর্যাপদে ব্যবহৃত আরেকটি চমৎকার ছন্দ ঃ

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ।।

বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
গেলি জাম বাহুড়ই কইসেঁ॥ —চর্যা ৮।

শ্রী কৃ ষ্ণ কী র্ত নে মোটামুটি তিন রকমের ছন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পয়ার সেখানে অনেকটা পরিণত, দশমাত্রার ছন্দ আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠেছে এবং ত্রিপদীতে লঘু দীর্ঘের অস্পষ্ট পদসঞ্চার সুরু হয়েছে।

পয়ারের নমুনা ঃ

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি | কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি | এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রন্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥

লঘু ত্রিপদী ঃ

একে দহ দহ ঘসির আগুন
আর কেনা জ্বালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পাইলোঁ
এ শাল থাকিল বুকে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ঃ

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়ি হাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালীয়দমন-খণ্ড থেকে দশ মাত্রার ছন্দের নমুনা উধৃত করি। এর চাল আট-দুই ঃ

উঠিলা সত্বরে নারা | য়ণ।
বাহু-ফাল করিআঁ ত- | খন॥

যেন তৃণ যাএ চণ্ড | বাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্ন- | মতে ॥
কালিয় দলিল দামো | দর
যমুনা জলের ভি- | তর ॥

## ॥ মঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ ॥

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে অনুমানিক খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য রচনা সুরু হয়। ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে 'মনসামঙ্গল' কাব্য পাওয়া গিয়েছে। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য চণ্ডীমঙ্গল ১৬শ শতাব্দী ও ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকাব্য ধর্মমঙ্গল ১৭শ শতাব্দী থেকে পাওয়া যাচ্ছে। শিবঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য 'শিবায়ন' এবং অন্নপূর্ণা দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত মাহাত্ম্যকাব্য 'অন্নদামঙ্গল' ১৮শ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে ॥

মঙ্গল কাব্যগুলিকে তিনটি স্তরে যদি ভাগ করি, তবে প্রথম স্তরের কবি কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত ইত্যাদি ; দ্বিতীয় স্তরের প্রধান কবি মুকুন্দরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী ; তৃতীয় স্তরের কবিদের মধ্যে প্রধান রামেশ্বর চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্র ॥

প্রথম স্তরের এবং দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের রচনায় ছন্দ বৈচিত্র্য নাই। তবে পয়ার এবং ত্রিপদী তাঁদের কাব্যে বলিষ্ঠ পদসঞ্চার করতে পেরেছে। একাবলী ছন্দের নমুনাও কোথাও কোথাও আছে। এখন থেকেই বাংলা কাব্যের মূল ভিত্তি পয়ার এবং ত্রিপদীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে—

আদি স্তরের ও মধ্যস্তরের পয়ারের নমুনা ঃ

কবাট করিয়া দূর | বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায় ॥
দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন কমলে ॥ —বিজয় গুপ্ত

যে শুনে তারকবধ কার্তিক নিধন।
তারে পূর্ণ কৃপা হরি করে অনুক্ষণ ॥
মৎস্য কূর্ম বরাহ নরহরি বামন
পঞ্চ অবতার সত্যে করিলা নারায়ণ ॥ —হরিদত্ত।

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীএ মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ *
বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর-দহনে ॥ —মুকুন্দরাম।

নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়া
জগৎ জাগাবে যশ যদি জিন যেঁষে ॥
গদ গদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায় ॥
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে ॥ —ঘনরাম।

এখানেও অনুপ্রাসের বাহুল্য লক্ষণীয়।

আদি ও মধ্যস্তরের ত্রিপদীতে লঘু ও দীর্ঘ দুই রকম চালই দেখতে পাচ্ছি :

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ —মুকুন্দরাম।

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এলে মঙ্গল গাইতে তারা চাইবে পান খাইতে
আর চাইবে তৈল সিন্দুরে ॥ —বিজয় গুপ্ত।

বিজয় গুপ্তের রচনায় আধুনিক বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রথম সূচনা দেখতে পাচ্ছি—

প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি ॥
আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড় খাউক যেমন ভাণ্ডাল মোরে ॥

[ * এই দুই পঙক্তিতে ম-এর অনুপ্রাস লক্ষ্যণীয় ]

ভারতচন্দ্রের হাতে যে-ছন্দের পরিণতি তার সূচনাও এই বিজয় গুপ্তের রচনায়—

জগত মোহন শিবের দাস।
সঙ্গে নাচে শিবের ভূত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহারিয়া গৌরীর মুখ।
নাচেরে মহাদেব মনেতে কৌতুক॥

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত লাচাড়ী ছন্দ :

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর
মনসা হউক সহায়।
তাঁর অনুবন্ধ লাচারীর ছন্দ
কবি পুরুষোত্তমে গায়॥

তৃতীয় বা শেষ স্তরের কবি ভারতচন্দ্র পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী ছাড়াও সংস্কৃতের নানা ছন্দ তাঁর অন্নদামঙ্গলে ব্যবহার করেছেন। আগে তার নিদর্শন দিয়েছি॥

**॥ বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দ ॥**

বৈষ্ণব পদাবলীতেও পয়ার এবং ত্রিপদী মূল বহু-ব্যবহৃত ছন্দ কখনও কখনও নতুন ছন্দ রচনার দিকেও ঝোঁক দেখা যায়। এরকম কয়েকটি উদাহরণ পাঠকদের সামনে আনি।

ছয়-পাঁচ মাত্রার চাল :

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অচলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥ —চণ্ডীদাস।

চোদ্দ মাত্রার নতুন চাল, ৪+৪+৪+২ এর ঝোঁক—

গুরু গর ' বিত মাঝে ' রহি সখী ' সঙ্গে।
পুলকে পূ ' রয়ে তনু ' শ্যাম পর ' সঙ্গে॥ —জ্ঞানদাস।

জয়দেবের অনুসরণে :

মুহুরব-লোকিত-মণ্ডন-লীলা
মধুরিপু রহমিতি ভাবন শালা॥ —জয়দেব।

ইথে যদি সুন্দরী তেজিবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ। —গোবিন্দদাস।

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডণং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্। —জয়দেব।

তুঙ্গমণি মন্দিরে ঘনবিজুরে সঞ্চরে
মেঘরুচিবসনপরিধানা॥ —শশীশেখর।

ছয়-ছয়-ছয়-ছয়-ছয়-ছয়-ছয়-দুই মাত্রার চাল ঃ

মঞ্জুবিকচ ' কুসুমপুঞ্জ | মধুপশব্দ ' গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জর গতি ' গঞ্জি গমন | মঞ্জুল কুল—নারী।* —জগদানন্দ।

সাত মাত্রার চাল ঃ

গগনে অবগন | মেহ দারুণ | সঘন দামিনী | ঝলকই
—রায় শেখর।

তুলনীয় বিদ্যাপতির—

এ ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর।

চৌপদী ঃ

নীল বসন দোঁহার গায়
কি মেঘে বিজুরী লুকিয়া যায়
মদন-দীপ পথ দেখায়
অনুরাগ আগুয়ান রে। —শশীশেখর।

* তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে—ইত্যাদি ( ভানুসিংহের পদাবলী )

# ।। বাংলা ছন্দের বিশেষত্ব ।।

প্রত্যেকটি পর্বে গোনাগুনতি মাত্রা ছন্দে-গাঁথা বাক্যে রাখতেই হবে—এটাই সাধারণ নিয়ম। বাংলায় কোন কোন ছন্দে এর ওপরেও একটা একটানা সুরের তান বা টেনে যাওয়া দরকার পরে। একে বলে তা ন প্র ধা ন ছন্দ। এর অন্য নাম অক্ষরবৃত্ত বা অক্ষরমাত্রিক ছন্দ।

নোটন নোটন | পায়রাগুলি | ঝোটন বেঁধে | ছে—
দুই ধারে দুই | রুই কাতলা | ভেসে উঠে | ছে—
কে দেখেছে | কে দেখেছে | দাদা দেখে | ছে—
দাদার হাতে | কলম ছিল | ছুঁড়ে মেরে | ছে—

এখানে প্রত্যেক পর্বে অক্ষর গুণতিতে সাম্য নাই। কিন্তু ছোট্ট শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময় মায়ের মুখে এর তাল কাটছে না। তার কারণ যেখানে অক্ষর গুণতিতে কম হচ্ছে সেখানে সুরটাকে টেনে মা ফাঁকটুকু ভর্তি করে দিচ্ছেন। 'কে দেখেছে' ছাপার অক্ষরে চারমাত্রা কিন্তু মুখে বলার সময় 'কে-এ' দেখেছে-এ। দুই মাত্রার কমতি সুর করে টেনে আমরা পুরিয়ে দিচ্ছি। টান বা তানের সাহায্যে কমতি-বাড়তির সামঞ্জস্য করা হয়, হ্রস্বস্বর-দীর্ঘস্বর সমান করা হয় বলেই এর নাম তানপ্রধান ছন্দ॥

কোন কোন ছন্দে আবার পর্বের মাত্রা সংখ্যাই প্রধান—ছন্দের ধ্বনিমাধুর্য মাত্রার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ধ্বনিটাই ছন্দের প্রাণ।—তাকে বলে ধ্ব নি প্র ধা ন ছন্দ। এর অন্য নাম মাত্রাবৃত্ত বা স্বরমাত্রিক ছন্দ।

এ আঁখি আমার | শরীরে ত নাই | ফুটেছে মর্ম | তলে
নির্বাণহীন | অঙ্গার সম | নিশিদিন শুধু | জ্বলে
সেথা হতে তারে | উপাড়িয়া লও | জ্বালাময় দুটো চোখ
তোমার লাগিয়া | তিয়াষ যাহার | সে আঁখি তোমার | হোক

এর চালটা ৬+৬+৬+২=২০ মাত্রার। প্রতিটি পর্ব সেভাবে ভাগ করা। অক্ষরের সংখ্যা এখানে কম বেশি হলে কোন ক্ষতি নাই—কোন অক্ষর কম হলে

অক্ষর বিশেষকে দীর্ঘ করে এবং বেশি হলে তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করে হলন্ত অক্ষরকে ছোট করে নিয়ে মাত্রা ঠিক রাখা হচ্ছে। যেমন নির্বানহীন-কে পড়ার সময় নির্বান হীন-ও, অঙ্গারসমকে অঙ্গারসম-ও করা হচ্ছে। ফলে ছয়মাত্রা প্রতি পর্বে ঠিক থাকছে।

এই ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান, শ্বাসাঘাত প্রধান—যতভাবেই ছন্দকে ভাগ করা হোক না কেন, একটা জিনিস সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা পরিষ্কার রাখা দরকার। সেটি হচ্ছে এই যে, সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটা বিশেষ প্রভেদ আছে, সেটি তার উচ্চারণ পদ্ধতিতে। সংস্কৃত উচ্চারণের প্রধান বিশেষত্ব তার ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা। বাংলাতে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কোন নিয়ম নাই। নদী আর যদি এক ভাবেই উচ্চারণ করা হয়। প্রাকৃত বাংলা অর্থাৎ যে বাংলা আমরা শিখেছি মায়ের মুখে শুনে, ছড়ায়, বাউলে, ভাটিয়ালী রামপ্রসাদীতে তার একটা নিজস্ব স্বভাব আছে—সেখানে সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজি, নানা শব্দ জড়ো হয়েছে, দীনতা কোথাও নাই। এবং তার ঐশ্বর্যকেও অস্বীকার করার উপায় নাই। সকলকেই সে পরম সমাদরে বুকে টেনে নিয়েছে। সাধু বাংলারও ক্ষমতা নাই তাকে অস্বীকার করে চলে। প্রাকৃত বাংলায় হসন্ত শব্দই বেশি এবং হসন্তের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সংঘাতে বাংলা ছন্দ একটা নিজস্ব রূপ পেয়েছে। বাংলা ছন্দে তাই টান আর তানেরই প্রাধান্য এবং সেই জন্যে বাংলা ছন্দে যত মাধুর্য, বোধহয় ভারতীয় অন্য কোন ভাষার ছন্দে তত মিষ্টতা নাই। আমাদের ভাষার স্থিতিস্থাপকতাই এই মাধুর্যের প্রধান অবলম্বন॥

এখন বাংলা ভাষায় কত রকম ছন্দ প্রচলিত তার কিছু নমুনা দেবার চেষ্টা করব।

প্রথমে পয়ার। কেননা, পয়ারের ওপর ভিত্তি করেই বাংলা অনেক ছন্দ বিকশিত। আগে দেখা যাবে পয়ারে বাঁধা ১৪ মাত্রার ছন্দ।—দুই পর্বে একটি চরণ, প্রথম ৮ মাত্রায় একটি যতি, ১৪ মাত্রায় এসে অর্থাৎ প্রথম যতির ৬ মাত্রা পরে পূর্ণ যতি।

তোমার মনেতে বাপু | আছে ত এখন ॥
ছেলেবেলা ছেলেখেলা | করেছ যখন ॥
কতবার দেখিয়াছ | খেলিয়া খেলিয়া ॥
রবির ছবির আগে | মুকুর রাখিয়া ॥ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

এই চার লাইনে যুক্তাক্ষর নাই। যুক্তাক্ষর-প্রধান পয়ারের উদাহরণ—

অনন্ত বসন্তে যেথা | নিত্য পুষ্পবনে ॥ (৮+৬=১৪ মাত্রা)
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।

প্রথম চরণটিতেই যতি চিহ্ন এবং মাত্রাভেদ দেখানো হল। বাকিগুলি পাঠক নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন।

এই চোদ্দ মাত্রাকে নানাভাবে সাজানো যেতে পারে। প্রথমে ২+২+২+২+২+২+২ঃ

এই ধরা এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল ॥
এই ঘ্রাণ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব।
এই এই এই এই এই এই সব ॥ —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৪+৪+৪+২-এর চাল ঃ

ধরণীর আঁখিনীর মোচনের ছলে।
দেবতার অবতার বসুধার তলে ॥ —রবীন্দ্রনাথ।

৩+৪ ও ৩+৪ এর চাল। এতেও চোদ্দ মাত্রা ঃ

ফাগুন এল দ্বারে কেহযে ঘরে নাই
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

—রবীন্দ্রনাথ।

৪+৩, ৪+৩ ভাগ ঃ

নয়নের´ সলিলে´ যে-কথাটি বলিলে
রবে তাহা স্মরণে জীবনেও মরণে। —রবীন্দ্রনাথ।

সাত-চার-তিনের ভাগ ঃ

একদা এলো চুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া। —রবীন্দ্রনাথ।

তিন-তিন-তিন-তিন-দুইয়ের চাল ঃ

বিজন বনের ব্যাকুল ফুলের বুকে
আকুল সুরভি একাকি ঘুমায় সুখে।

সব উদাহরণগুলিই চোদ্দ মাত্রার কিন্তু কোনটিই পয়ার নয়। আসলে এখানে সমষ্টি নিয়ে ঝগড়া নাই, চাতুর্য হচ্ছে এই চোদ্দ মাত্রাকে বিচিত্রভাবে সাজানোতে। এবং তাতেই ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ছে। এং রকমভাবে ছন্দের মাত্রাভাগের ওপরেই ছন্দের প্রকৃতিভেদ গড়ে ওঠে॥

১৪ মাত্রার পয়ার চালে মাত্রা সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬, ১৮ ২০ ইত্যাদির পয়ার রচনা করা যেতে পারে। তাকে বলে দী র্ঘ প য়া র।

১৬ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার ঃ

অন্ধকারে বসে আছি | জেগে আছি তার তরে॥
যে আসিবে একাকিনী | মোর এই ভাঙা ঘরে॥

১৮ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার ঃ

দৃষ্টির দুয়ার রুদ্ধ। অন্ধকারে শুধু বোঝা যায়
এ সেই সমুদ্রতীর, দৃঢ়পুচ্ছ হাওয়ার চাবুকে
যেখানে সম্বিত জাগে মূর্ছিত হৃদয়ে। চোখে মুখে
যন্ত্রণা জ্বালিয়ে নিয়ে যদি তার প্রতীক্ষায় থাকি,
তবে বন্ধ্যা জীবনের আদিগন্ত বালুকাবেলায়
তরঙ্গ বাড়াবে হাত। কয়েক মুহূর্ত তার বাকি॥

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

আবার আট-চার-ছয় ভাগেরও দীর্ঘ পয়ার হতে পারে। এখানেও মাত্রাসংখ্যা আঠারো ঃ

ভুটিয়া গরুর পাল চান্‌কোনা পাহাড়ের কোলে।
ঠাণ্ডা নদীর জলে নীলবড়ি মিশিয়েছে কেউ।
সোনা ঝুরি-লতা-ঢাকা একগাছ সে যেন কেমন।
এই কুহকের দেশে নীলনদী কুলে কুলে বয়।

—হরপ্রসাদ মিত্র।

২০ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার ঃ  দশ-চার-ছয় ভাগ।

প্রেম তাকে করে গেছে কবে | উপহাস, | আত্মার আত্মীয় ॥
যারা ছিল, দীর্ঘদিন ধরে  নানাছলে  তাকে সামনে রেখে
কৌশলে শোষণ ক'রে  ক'রে তাকে দেখো  করেছে অপ্রিয়
জনতার বাজারেতে ; আর  সে বেচারী  সব দেখে দেখে
চিরকাল নির্বিকার, তবু  যন্ত্রণাত  দিলনা রেহাই !

২২ মাত্রার দীর্ঘ পয়ার।  আট-আট-ছয় চাল।

মন্থিত স্মৃতির রাত্রে  শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে  বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভরে  বুনে গেছি কত শত  আকাশ কুসুম।

—বিষ্ণু দে।

এই রকম চব্বিশ, ছাব্বিশ, আঠাশ মাত্রার দীর্ঘপয়ারও হতে পারে ॥

পয়ারেরই মত, অথচ পয়ারের চেয়ে মাত্রাসংখ্যা কম, এগারো কিম্বা বারো মাত্রার দুই পর্বের চরণবিশিষ্ট ছন্দের নাম এ কা ব লী ॥

এই এগারো মাত্রাকে নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে দেখাই ছয়-পাঁচের ভাগ ঃ

বড়র পিরীতি | বালির বাঁধ ॥
ক্ষণে হাতে দড়ী | ক্ষণেকে চাঁদ ॥  —ভারতচন্দ্র।

আট-তিনের ভাগ ঃ

চামেলীর ঘনছায়া | বিতানে ॥
বনবীণা বেজে ওঠে | কি তানে ॥
স্বপনে মগন সেথা  মালিনী
কুসুম মালায় গাঁথা  শিথানে  — রবীন্দ্রনাথ।

খুব দক্ষতার সঙ্গে নয়-দুইয়ের ভাগ করেছেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ

নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা | শুধু ॥
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের জানলা দিয়ে  ধূধূ
অফুরন্ত মাঠ দেখবে আর

পশ্চিমের জানলা দিয়ে লাল
সূর্য-ডোবা সন্ধ্যার বাহার।

বারো মাত্রার একাবলী। ছয়-ছয় ভাগ:

জগত-মাঝারে | যেথায় বেড়াবি ॥
যেথায় বসিবি যেথায় দাঁড়াবি
বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে —রবীন্দ্রনাথ।

ছয়-ছয় ভাগ, কিন্তু ঝোঁকটা অন্যরকম—

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হলো দ্বার ॥
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে উচ্চ হাহাকার —রবীন্দ্রনাথ।

প্রতি চরণে যতি তিনটে, পর্বগুলি পয়ারের মত—এরকম ছন্দকে বলে ত্রিপদী। ত্রিপদী দুই রকম। লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদী: ছয়-ছয়-আট মাত্রার চাল—

সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ —ভারতচন্দ্র।

চার-চার-সাত মাত্রার লঘু ত্রিপদী:

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে ॥ —ভারতচন্দ্র।

দীর্ঘ ত্রিপদী: বহু রকমের হতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ:

বুঝিগো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখিদুটি,
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা ওঠে ফুটি। —রবীন্দ্রনাথ।

নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এসো আজ
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগতরঙ্গরাশি অঙ্গখানি নিবে গ্রাসি
উচ্ছ্বসি পরিবে আসি উরসে গলে। —রবীন্দ্রনাথ।

মাথার উপরে তোর নীলের অনন্ত পারাবারে
সাদা মেঘে ছুটে মোর প্রাণ
ত্রিকূট-পাহাড় শিরে দাঁড়াইয়া দিকচক্রবালে
ভেসে আসে প্রিয়ের আহ্বান।

—শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

প্রতি চরণে যেখানে যতি চারিটি, সেখানে নাম চৌ প দী। চৌপদীও লঘু ও দীর্ঘ দুই রকম হতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের চৌপদীর উদাহরণ ঃ

ফেলে রেখে আয় হাসি ক্রন্দন
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন
হেথা ছায়া আছে চির নন্দন
চির বসন্ত-বায়। —রবীন্দ্রনাথ।

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি
অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ—
নিনাদে। —রবীন্দ্রনাথ।

খরবায়ু বয় বেগে
চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে নাও খানি
বাইও। —রবীন্দ্রনাথ।

ভারতচন্দ্র থেকে একেবারে হালের কবিরা কত বিচিত্র ছন্দে যে বাংলা কাব্য রচনা করেছেন তার নমুনা দেখলে এইসব কবিদের ছন্দসৃষ্টির প্রতিভাকে প্রশংসা

করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু, তাঁর ছন্দ নিয়ে অজস্র পরীক্ষা আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথকেও বলা হত ছন্দরাজ। তিনি বাংলা ছন্দে সংস্কৃত প্রাকৃত ছড়ার ছাঁদ ত বটেই, বিদেশেরও বহু ছন্দ বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। বিচিত্র ছন্দের স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শিশুদের সবচেয়ে প্রিয় কবি সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসুও বহু ছন্দ উদ্ভাবন করেছেন। এঁদের রচনা বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছে অল্পাধিক পরিচিত। এঁরা ছাড়াও আধুনিককালের বহু কবি ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা করছেন। এই কবিদের রচনা থেকে কিছু নমুনা পাঠকদের উপহার দেব ॥

মধুসূদনের যেমন অমরকীর্তি অমিত্রাক্ষরছন্দে বাংলা কবিতা রচনা, রবীন্দ্রনাথের তেমনি বাংলা কাব্যে মহৎ সৃষ্টি মুক্তছন্দ। রবীন্দ্রনাথের মুক্তছন্দ চিরন্তন চলে-যাওয়ার ছন্দ। যেন নদীর স্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু পদক্ষেপে যেমন আমরা একটা তাল রক্ষা করে চলি, এই মুক্তছন্দেও তেমনি একটা নিয়ম আছে।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকার মুখর এই ভুবন-মেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি
বক্ষ তোর উঠে রণরণি।
নাহি জানে কেউ —
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে ;

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ থেকে।

এখানে ভাগটা হচ্ছে চার-দুই। কোন পঙক্তিতে তিনটে চারমাত্রা শেষটা দুই মাত্রা—যেমন,

ঝংকার মু | খর এই | ভুবন মে | খলা

কোথাও আবার একটা চার, একটা দুই—

রূপ হতে | রূপে

স্বরবৃত্ত ছন্দেও মুক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন—

কখন শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি—
জানতো না ত আপনাকে সে
শুধায়নি তার নাম কোনোদিন বাহির হ'তে খেপা বাতাস এসে,
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়ীভারে আপনি সমাকুল।

—'পলাতকা'র 'নিষ্কৃতি' কবিতা থেকে।

মধুসূদন অমিত্রাক্ষর সৃষ্টি করে পয়ারের কঠিন শিকল থেকে বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন আর রবীন্দ্রনাথ তাকে মুক্তছন্দের ও গদ্যছন্দের মাধ্যমে দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ গতি। এই মুক্তছন্দ পরবর্তীকালের কবিদের হাতেও নতুনরূপ পাচ্ছে—

বাড়ীতে ময়না ছিল। তারি এক অসুখের দিনে
ডাকা হল সে বুড়োকে, নাম হরিলাল,
পাখীঅলা—কয়েকটি খাঁচায়
চন্দনা ময়না টিয়া বজ্‌রিগার নিয়ে মাঝে মাঝে
যেত এ রাস্তায় ; তারি শুশ্রূষায় পাখী—
ভাল হল ; সেই থেকে সে এসেছে কাজে ও অকাজে। —মনীন্দ্র রায়।

কবিতাংশটির সহজ সরল সাবলীল ভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অরুণ মিত্রের হাতে একটি আশ্চর্য পরিপূর্ণতা পেয়েছে—

আমার চারপাশে তারা ভীড় করে এসেছে।
এ জায়গায় বিপুল জলের ভাঙন। সবই আছে,
স্পষ্টতার এলাকা এটা নয়। ভালো করে দেখে
তবে তাদের চেনা গেল। তাদের আলাদা আলাদা
নাম আমি আর বলতে পারি না। আমার
মনে হল নিঃসঙ্গতাকে যদি কোনো নাম ধ'রে
ডাকা যায় তাহলে তারা সবাই একসঙ্গে সাড়া দেবে। —(অন্তরঙ্গ)

এই ধারায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষা :

সেই কোন্ সকালে
এই শহর
তার প্রকাণ্ড মুঠোটা খুলে
দূরে দূরে
দূরে—দূরে
আমাদের ছড়িয়ে দিয়েছিল—
তারপর সন্ধ্যা এসে
খুঁটে খুঁটে তুলে
এক জায়গায় আবার আমাদের
মিলিয়ে দিয়ে গেল। —(কে জাগে)

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-ও ছন্দের নানা পরীক্ষা করেছেন। তাঁর 'আসমুদ্ররুদ্র' কবিতাটি একসময় বাঙালী কবি মহলে খুবই আলোড়ন এনেছিল। তাঁর অন্য একটি কবিতার একটু উদাহরণ :

একটি মেয়ের চোখ আজকে বারবার মনে পড়ে
প্রথম প্রাণের কথা হঠাৎ উস্‌খুস সেই চোখে,
টিয়াপাখি-রঙ শাড়ি নেশায় রিমঝিম্ : বলে লোকে।
এমনি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে। —(মনে পড়ে)

কবি চিত্ত ঘোষের কয়েকটি পঙক্তি ঃ

আকাশে দূর মেঘেরা কই অলীক উড়ো পাখি
বৃষ্টি যেন স্মৃতির গানে ঝরে—
হৃদয়ভরা ইচ্ছাগুলো ঘুম পাড়িয়ে রাখি
নদীর নাম ভোরের গ্রাম এখনো মনে পড়ে।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতেও ছন্দের নানা পরীক্ষা হয়েছে। তাঁর 'পূর্বরাগ' নামে দীর্ঘ কবিতাটি ছন্দময় গতিময়তার একটি সুন্দর উদাহরণ। অন্য কবিতাতেও বিচিত্র ছন্দের পরীক্ষার চেষ্টা আছে। যেমন,

বন্ধুরা তাকে যেটুকু দিয়েছে,
শত্রুরা তার সব কেড়ে নিয়ে
কোনো দূর দেশে ছেড়ে দিয়েছিল
কোনো দুর্গম পথে। তারপর
যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে,
শোকের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে
প্রেম তাকে দিল সান্ত্বনা, দিল
স্বয়ংশান্তি তৃপ্তির ঘর।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দীনেশ দাস প্রমুখ অগ্রজ কবিদের পরে বাংলা কাব্যে যাঁরা নূতন ধারা এনেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিমলচন্দ্র ঘোষ, অরুণ মিত্র, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং আরো বহু তরুণতর কবি। সকলের কবিতার নমুনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। এঁরা সকলেই পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে বাংলা কবিতার চর্চা করেছেন এবং নানাভাবে তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতিও পেয়েছেন। এঁদের আন্তরিক এবং নির্ভয় প্রচেষ্টাই বাংলা কবিতার রূপবদল ঘটিয়াছে—এখনও তা চলেছে। সহৃদয় পাঠকের মনোযোগ এই সব শক্তিশালী কবিদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সময় এসেছে॥

## । বাংলা সনেট

বাংলাতে চতুর্দশপদী কথাটি দিয়ে আমরা সনেট জিনিষটা বোঝাবার চেষ্টা করি। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ধারায় সনেটের আদি রচয়িতা শ্রীমধুসূদন সনেটের বাংলা নামকরণ করেছেন চতুর্দশপদী ; কিন্তু চোদ্দ পঙক্তির কবিতা এবং সনেট এক জিনিষ নয়। সনেটের এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এর ভাবে ও রূপে সেই বিশেষত্বগুলি রক্ষা করা এমন কঠিন যে, অনেক বড় বড় কবি অন্যদিকে খ্যাতিমান হলেও সনেট রচনায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি॥

আগেই বলা হয়েছে সনেট জিনিষটি বিদেশি। ইতালীর পেত্রার্ক এবং দান্তের হাতে সনেটজাতীয় কবিতা একটি সম্পূর্ণতার স্তরে পৌঁছায় এবং ১৫৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে ওয়েট এবং সারে ইংরাজি সাহিত্যে সনেটের সূচনা করেন। পরে মহাকবি শেক্সপীয়রের নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে ইংরাজি সনেটের একটা নিজস্ব বিশেষত্ব ফুটে উঠল, শেক্সপীরিয় সনেট নামে সেই বিশেষত্বকে চিহ্নিত করা হল। শেক্সপীয়রের সনেটে পেত্রার্কের কঠোর নিয়মবন্ধন না থাকলেও গাঢ় ও গভীর ভাবাবেগে বিশিষ্ট। পরে মিল্‌টনের হাতে সনেটের ইতালীয় নিয়মবন্ধন কিছুটা রক্ষিত হবার চেষ্টা দেখা যায়। ইতালীয় ধারায় সনেট রচনায় ইংরেজ কবি ডি. জি. রসেটি এবং বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি রিউপার্ট ব্রুক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কবি কীট্‌স্‌ও কিছু উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন, কিন্তু তাতে শেক্সপীরিয় ধারাই সমধিক স্পষ্ট॥

বাংলাতে শ্রীমধুসূদনই প্রথম পাশ্চাত্য সনেটের আদলে এবং আদর্শে বাংলা সনেট রচনা করেন। তিনিই বাংলা সনেটের ছন্দ ও আকৃতি কি হবে সে সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট দৃঢ় ধারণা তৈরী করে দিয়ে গেছেন। 'কবির অতিশয় নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাব ও চিন্তা প্রকাশের জন্য সনেট যে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য-কৌশল, তিনি এই

রচনাগুলিতে• তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন'—এই কথা বলেছেন, বিশিষ্ট সমালোচক ও কবি মোহিতলাল মজুমদার ॥

কিন্তু মধুসূদনের পরবর্তী বিশিষ্ট কবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র বা অন্যান্য কবিরা সনেট রচনায় কোন উৎসাহই দেখাননি। তার প্রধান কারণ সনেট রচনায় যে ভাবসংযম ও গূঢ় গভীর লিরিক সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করার ক্ষমতার প্রয়োজন হয় এইসব কবিদের সেই ক্ষমতা ছিল না। পরে দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল—সমসাময়িক এই তিন কবি কিছু উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন। এই তিন কবির রচনাতে তিন ধরণের বিশেষত্ব দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের সনেট আবেগময়, ভাবোদ্বেল অথচ গাঢ়বন্ধ ও সংযত। কবি অক্ষয়কুমারের সনেট ভাবসংযমী কিন্তু গীতিরসে তেমন উজ্জ্বল নয়। 'এ যেন একটি সুদৃঢ় কৌটায় একটি সুস্পষ্টভাব বা সুন্দর চিন্তাকে সযত্নে ভরিয়া রাখা'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আদি বা ইতালীয় সনেটের সমস্ত নিয়মের শৃঙ্খল ভেঙে সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় সনেট রচনা করেছেন। 'কেবলমাত্র সুর এবং ভাবগত সৌন্দর্যের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন তিনি স্বীকার করেন নাই, যেখানেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন সেইখানেই অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন' ॥

কবি প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ফরাসী ধারায় বাগ্‌বৈদিগ্ধ্য, চিন্তাঘটিত চাতুরী এবং তীক্ষ্ণ ও মার্জিত বুদ্ধির বিজ্ঞতায় সমুজ্জ্বল। তাঁর সনেটের ভাববস্তু কদাচিৎ কাব্যবস্তু, ভাষাও কোন ক্ষেত্রে কবি-ভাষা নয়, কিন্তু তবুও উজ্জ্বল সরস তীক্ষ্ণ বাক্‌পটুতাগুণে এই সনেটগুলির একটি নিজস্ব চরিত্র আছে ॥

আধুনিককালের অগ্রজ কবিদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রমুখ কবিদের সকলেই সনেট রচনা করেছেন। সেগুলি কখনও classical, কখনও বা রোমান্টিক কখনও বা মিশ্রজাতীয়। তাঁদের অনুজ কবিদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট কবি সনেট রচনায় মনোযোগ করেছেন। আমাদের সাহিত্য-উদ্যানে এই বিদেশি কুসুমের চাষে নানা পরীক্ষার ধারা আজও অব্যাহত ॥

খুব সংক্ষেপে এই হল বাংলা সনেটের একটা কালানুক্রমিক পরিচয়। কিন্তু সনেট জিনিষটি যে কি সে-সম্বন্ধে আলোচনা এখনও করা হয়নি। অল্প কথায় পাঠককে এবার সে-সম্বন্ধে বোঝাবার চেষ্টা করব ॥

প্রথমে সনেটের বাইরের গড়ন সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। সনেটে চোদ্দটি পঙক্তি থাকতে হবে। চোদ্দটি পঙক্তির একটি সম্পূর্ণ স্তবকে একটি গোটা কবিতার ভাব প্রকাশ করতে হবে। এই চোদ্দ পঙক্তিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম আট পঙক্তিকে ইংরেজিতে বলে Octave বা অষ্টক ; পরবর্তী ছয় পঙক্তিকে বলে Sestet বা ষট্‌পদী। এই দুই ভাগের মিলনবন্ধনেং একটা নিয়ম আছে। কোনও কোন সনেটের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম পঙক্তির শেষ শব্দগুলির পর পর মিল হবে একরকম ; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম পঙক্তির শেষ শব্দের পর পর মিল হবে অন্যরকম। শেষ ছয় পঙক্তির নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ পঙক্তির মিল হবে পরপর একরকম ; দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ পঙক্তির পরপর মিল হবে অন্যরকম। একটা উদাহরণ ঃ

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বারোমাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে
পেয়েছি উমায় আমি, কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা, এ মন জুড়াবে ?
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম, এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে !
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি "—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী ॥

[ বিজয়া-দশমী ঃ মধুসূদন ]

এখানে 'যেয়োনা রজনী' থেকে 'এ মন জুড়াবে' পর্যন্ত octave, আর 'তিনদিন স্বর্ণদীপ' থেকে 'গিরীশের রাণী' sestet। octave-এর প্রথম (তারাদলে),

তৃতীয় ( অচলে ), পঞ্চম ( অশ্রুজলে ), সপ্তম ( কুণ্ডলে ) পরপর একরকম মিল। আবার দ্বিতীয় ( যাবে ), চতুর্থ ( হারাবে ), ষষ্ঠ ( ভাবে ), অষ্টম ( জুড়াবে ) এক ধরণের মিল। তেমনি sestet-এর নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ এবং দশম, দ্বাদশ, চতুর্দশ পরপর ক্রমান্বয়ে মিল দেওয়া॥

আদি বা ইতালীয় সনেটের মিলের ধারা octave অংশে প্রথম-চতুর্থ, পঞ্চম-অষ্টম পংক্তির মিল একরকম ; দ্বিতীয়-তৃতীয়, ষষ্ঠ-সপ্তমের মিল হবে একরকম। আর sestet অংশে মিল হবে নবম-দ্বাদশ, দশম-ত্রয়োদশ এবং একাদশ-চতুর্দশ। সংক্ষেপে octave অংশে AB BA AB BA ; Sestet অংশে CDE CDE কিম্বা CD CD CD-ও হতে পারে।

উদাহরণ ঃ

| | |
|---|---|
| কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,— | A |
| ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?— | B |
| আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে— | B |
| রতন তোমার মত, কহ সহচরি— | A |
| গোধূলির ? কি ফনিণী, যার সু-কবরী | A |
| সাজায় যে তোমাসম মণির উজ্জ্বলে ?— | B |
| ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে | B |
| কি হেতু ? ভালো কি তোমা বাসে না শর্বরী ? | A |
| হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ-মনে | C |
| মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে | D |
| না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল সনে | C |
| যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে ? | D |
| কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গণে ? | C |
| ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে। | D |

[ সায়াংকালের তারা ঃ মধুসূদন ]

ইংরেজ কবি মিল্টন ইতালীয় সনেটের মিলবিন্যাসের আদর্শ কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। কিন্তু মহাকবি শেক্সপীয়র মিলবিন্যাসের নূতন ধারা প্রবর্তন

করেন। সেটির ছাঁদ—ABAB, CDCD, EFEF, GG। শেক্সপীয়রের সনেটের নমুনা—

| | |
|---|---|
| ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর ; | A |
| ধরার জঠরভরা তারই যত সুরূপ সন্তানে ; | B |
| উপাড়ি ব্যাঘ্রের দন্ত, হান তার জিঘাংসা প্রখর ; | A |
| অচিরে মরুক ডুবে রক্তবীজ নিজ রক্তবানে। | B |
| যা তুই উজ্জ্বল কাল ইচ্ছামতো ছড়াগে জগতে | C |
| সুসময়, দুঃসময় নির্বিচার ঋতচক্র থেকে ; | D |
| মাধুরীর অপমান হয় যদি, হোক পথে পথে | C |
| আমার বারণ শুধু একটি পাপের অতিরেকে। | D |
| পুরাতন লেখনীতে কোনদিন চাসনে অঙ্কিতে | E |
| আমার প্রিয়ার ভাল প্রহরের কুটিল রেখায় ; | F |
| তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ূরপঙ্খীতে ; | E |
| সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বলে, নিত্য যেন প্রতিষ্ঠা সে পায়। | F |
| না, তোরে সাধি না, কাল ; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন | G |
| আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন ॥ | G |

[ Sonnet XIX সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ ]

আধুনিক বাঙালী কবিরা সনেট রচনায় মিলবিন্যাস সম্বন্ধে নানাবিধ স্বাধীনতা নিচ্ছেন ॥

এবারে সনেটের ভাবের দিক কি বিশেষত্ব সেটা উপস্থিত করি। ইংরেজ কবি ডি. জি রসেটি বলেছেন—

A Sonnet is a moment's monument,
Memorial from the Soul's eternity
To one dead deathless hour.*

* House of Life সনেট-কাব্যের প্রথম সনেটের অংশ ॥

আরেকজন সমালোচক বলেছেন —

He ( সনেট রচয়িতা ) pipes a solitary tune of his own life, its devotion its prophetic exaltation, its passion, its despair, its exceeding bitterness.

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন ঃ

> যে ব্যক্তিগত সুগভীর ও আন্তরিক অনুভূতি ধ্যান ও গীত কল্পনার নিরন্তর আবেগে, শুক্তির মধ্যে মুক্তার মতই —প্রাণের মধ্যে অতিশয় নিটোল স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল কাব্যরূপে ফুটিয়া উঠে তাহাই সনেটের উপজীব্য।

প্রবল গভীর বেদনায় যেখানে বন্ধন নাই, সেখানে জন্ম গীতিকবিতার ; কিন্তু যেখানে সেই passion একটি মাত্র ভাবের বন্ধনে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত—একদিকে আবেগ অন্যদিকে অন্তর্লীন গভীরতা, একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস অন্যদিকে কঠিন নিয়মবন্ধনের অকৃত্রিম আন্তরিকতা—এই দুইয়ের সামঞ্জস্যে সনেটের জন্ম বলেই তা এত বিস্ময়কর এবং দুরূহ। তাই সনেটের ভাষায় কোন শিথিলতা বা অপরিচ্ছন্নতা থাকলে চলবেনা, থাকবে না অর্থদুরূহতা বা অস্পষ্টতা ; সমগ্র কবিতাটি একটি সম্পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু হওয়া চাই—একটি ভাব, একটি কল্পনা, একটি কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি পঙক্তিতে পঙক্তিতে বিকশিত হয়ে একটি ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং ভাবের মধ্যে রাখতে হবে dignity এবং repose। এতগুলি গুণের একত্র সম্মিলন কঠিন বলেই সকলে সনেট লিখতে পারেন না ॥

আধুনিককালের কবিদের অনেকে অন্যদিকে কৃতী হলেও সনেট রচনায় তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। আবার কেউ কেউ সনেট রচনায় আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সমর সেন, বিষ্ণু দে, অজিত দত্তের সনেটে যে ভাব গভীরতা ও নিয়ম বন্ধনের মধ্যেও সুগভীর কবি কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে—তা অন্যত্র দুর্লভ। সকলের সনেট উধৃত করা স্থানাভাব বশতঃ সম্ভব হলো না—এজন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা চাই। শুধু অনুজ কবিদের মধ্যে একজনের একটি সনেট পাঠকদের সামনে উপস্থিত করি। এতে দেখা যাবে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তু বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধ্য দিয়ে কিভাবে সনেটের দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে সার্থক রূপ পেতে পারে।

কবিতাটির নাম 'এশিয়া'। ১৩৫৪ সালের কার্তিক মাসের অধুনালুপ্ত 'ক্রান্তি' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন অস্ফুষ্ট আলো। ফিকে ফিকে ছায়া অন্ধকারে
অরণ্য সমুদ্র হ্রদ রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন ; কঠিন কপাট
ভেঙে পড়ে। দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘরাত্রি মরে যায়, ধ্বসে পড়ে জীর্ণ রাজ্যপাট ;
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, ভস্ম অপমান-শয্যা ছাড়ো
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।

সহরে বন্দরে গঞ্জে গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ দ্বীপে দ্বীপে মুষ্টিবদ্ধ আহ্বান পাঠায় ;
অগণ্য মানব শিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তারপর
ভারতে সিংহলে ব্রহ্মে ইন্দোচীনে ইন্দোনেশিয়ায়
বীতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুৎ উল্লাসে নেয় বাঁক ॥

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

---